পবিত্র কোরআনের আলোকে সহিহ ঈমান, আকীদা ও আমল

(সঠিক বিশ্বাস, বিশ্বাসের বিষয় সমুহ ও কাজ / করণীয়)

মুলঃ খাদেমুল ইসলাম ডাঃ এ এন এম এ মোমিন রহঃ

সংকলন ও সম্পাদনায়ঃ ইবনে মোমিন

মহান স্রষ্টা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য যার গুণরাজী কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করে শেষ করতে পারে না। তাঁর নেয়ামতসমূহ গণনাকারীরা গুনে শেষ করতে পারে না। প্রচেষ্টাকারীগণ তাঁর নেয়ামতের হক আদায় করতে পারে না। আমাদের সমুদয় প্রচেষ্টা ও জ্ঞান দ্বারা তার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা সম্ভব না এবং আমাদের সমগ্র বোধশক্তি দ্বারা তার মাহাত্ম্য অনুভব করা সম্ভব না। তার গুণ বর্ণনার কোন পরিসীমা নির্ধারিত নেই এবং তা কোন লেখা বা বক্তব্য, কোন সময় বা স্থিতিকাল দ্বারা নির্দিষ্ট করা সম্ভব না। তিনি নিজ কুদরতে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন, আপন করুনায় বাতাসকে প্রবাহিত করেছেন এবং শিলাময় পাহাড় দ্বারা কম্পমান পৃথিবীকে সুদৃঢ় করেছেন।

আল্লাহর মারেফতই তথা তার পরিচয় লাভ করা তথা তাকে জেনে বুঝে তার নৈকট্য লাভ করাই হল দ্বীনের ভিত্তি। এ মা'রেফাতের পরিপূর্ণতা আসে তাঁকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ায়; সাক্ষ্যের পরিপূর্ণতা হয় তাঁর একত্বের বিশ্বাসে; বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা হয় তার মহা পবিত্র সত্তাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তথা তার সাক্ষাত লাভের জন্য আমল করায়; আমলের পূর্ণতা অর্জিত হয় তাঁর প্রতি সত্তা বহির্ভূত কোন বৈশিষ্ট্য আরোপ না করায়। কারণ কোন কিছুতে বৈশিষ্ট্য আরোপিত হলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আরোপিত বিষয় থেকে তা পৃথক এবং যার ওপর বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয় সে নিজে সেই বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক। যে কেউ আল্লাহতে সত্তা বহির্ভূত কোন সিফাত বা গুন বা বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সে তাঁকে ঐ গুন বা বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতির আপেক্ষিক সদৃশতার স্বীকৃতি দেয়; যে তাঁর আপেক্ষিক সদৃশতা স্বীকার করে সে তার দ্বৈতের স্বীকৃতি দেয়; যে তাঁর দ্বৈতের স্বীকৃতি দেয় সে তাঁকে খন্ডভাবে দেখে; যে তাকে খন্ডভাবে দেখে সে তাঁকে ভুল বুঝে; যে তাঁকে ভুল বুঝে সে তাকে চিনতে অক্ষম; যে তাকে চিনতে অক্ষম সে তার ত্রুটি স্বীকার করে; সে তার ত্রুটি স্বীকার করে; সে তাঁকে সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ করে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে তিনি কি, সে জেনে রাখুক, তিনি সব কিছু ধারন করে আছেন; এবং যদি কেউ প্রশ্ন করে তিনি কিসের ওপর আছেন, সে জেনে নাও, তিনি নির্দিষ্ট কোন কিছুর উপর নেই। যদি কেউ তার অবস্থিতি নির্দিষ্ট কোন স্থানে মনে করে তবে সে কিছু কিছু স্থানকে আল্লাহ বিহীন মনে করল । তিনি ওই সত্তা যাঁর আগমন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে নি। তিনি অস্তিত্বশীল, কিন্তু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসেন নি। তিনি সব কিছুতেই আছেন, কিন্তু কোন প্রকার ভৌত নৈকট্য দ্বারা নয়। তিনি সব কিছু থেকে ভিন্ন, কিন্তু বস্তুগত দ্বান্দ্বিকতা ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে নয়। তিনি কর্ম সম্পাদন করেন কিন্তু সঞ্চলন ও হাতিয়ারের মাধ্যমে নয়। । তিনিই একমাত্র একক সত্ত্বা, যিনি তখনও দেখতেন যখন দেখার মতো কিছু সৃষ্টি হয় নি, যখন এমন কিছুই ছিল না, যার সাথে তিনি সঙ্গ রাখতেন অথবা যার অনুপস্থিতি অনুভব করতেন।

নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি

মহান আল্লাহ সৃষ্টির সূত্রপাত করলেন একান্তই মৌলিকভাবে-কোন প্রকার প্রতিরূপ ব্যতীত, কোন প্রকার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যতীত, কোনরূপ বিচলন ব্যতীত এবং ফলাফলের জন্য কোনরূপ ব্যাকুলতা ব্যতীত। সব কিছুকে তিনি নির্দিষ্ট সময় দিলেন, তাদের বৈচিত্র্যে সামঞ্জস্য বিধান করলেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সৃষ্টির পূর্বেই তিনি সব কিছুর প্রবণতা, জটিলতা, সীমাবদ্ধতা ও দূর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

অতঃপর পবিত্র সত্তা অনন্ত শূন্য সৃষ্টি করলেন এবং প্রসারিত করলেন নভোমন্ডল ও বায়ু স্তর। তিনি উচ্ছল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ পানি প্রবাহিত করলেন। তরঙ্গগুলো এত ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ছিল যে, একটা আরেকটার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিলো। তরঙ্গাঘাতের সাথে তিনি প্রবল বায়ুপ্রবাহ যুক্ত করলেন এবং প্রবল ঘূণিঝড়ের প্রকম্পন সৃষ্টি করলেন। পানির

বাস্পীয় অবস্থাকে তিনি বৃষ্টিরূপে পতিত হবার নির্দেশ দিলেন এবং বৃষ্টির প্রাবল্যের ওপর বায়ুকে নিয়ন্ত্রণাধিকার দিলেন। মেঘের নিচে বায়ু প্রবাহিত হতে লাগলো এবং পানি বায়ুর ওপর প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত হতে লাগলো।

অতঃপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ বাতাস সৃষ্টি করে তাকে নিশ্চল করলেন, তার অবস্থান স্থায়ী করলেন, তার গতিতে প্রচন্ডতা দিলেন এবং তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি বাতাসকে আদেশ করলেন গভীর পানিকে গতিশীল ও চঞ্চল এবং সমুদ্র তরঙ্গকে তীব্রতর করার জন্য। ফলে বাতাস দধি তৈরির মতো পানিকে মন্থন করতে লাগলো এবং এমন জোরে মহাশূন্যে প্রক্ষেপ করলো যে-সম্মুখ পশ্চাতে ও পশ্চাত সম্মুখে চলে গেলো। এতে ওপরের স্তরে বিপুল ফেনপুঞ্জ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত স্থিরকে অস্থির করে রাখলো। সর্বশক্তিমান তখন ফেনপুঞ্জকে অনন্ত শূন্যে উত্তোলন করে তা থেকে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করলেন যার সর্বনিম্ন স্তর স্ফীত। অথচ অনঢ় এবং ওপরের স্তর আচ্ছাদনের মতো বিদ্যমান-যেন এক সুউচ্চ বৃহৎ অট্টালিকা যাতে কোন স্তম্ভ নেই অথবা একত্রে জোরে লাগাবার পেরেক নেই। তখন তিনি ওপরের স্তরকে উজ্জ্বল তারকামণ্ডলী দিয়ে সুশোভিত করলেন এবং আবর্তিত আকাশ, চলমান আচ্ছাদন ও ঘূর্ণায়মান নভোমন্ডলে তিনি দেদীপ্যমান সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্রকে স্থাপন করলেন।

ফেরেশতা সৃষ্টি

অতঃপর মহান স্রষ্টা বিভিন্ন আকাশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট স্থান বিন্যাস করলেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ফেরেশতা দ্বারা নির্ধারিত স্থানসমুহ পরিপূর্ণ করলেন। তাদের মধ্যে কেহ-কেহ সেজদাবনত যারা কখনো রুকু করে না, কেহ-কেহ রুকু অবস্থায় যারা কখনো দাঁড়ায় না এবং কেহ-কেহ সুবিন্যস্তভাবে অবস্থান করছেন যারা কখনো তাদের স্থান পরিত্যাগ করেন না। অন্যরা সর্বক্ষণ আল্লাহ্র তসবীহ পাঠ করেন এবং তারা ক্লান্ত হয় না। নয়নের নিদ্রা, বুদ্ধির বিভ্রান্তি, শরীরের অবসন্নতা অথবা বিস্মৃতির প্রভাব এদের স্পর্শ করে না।

ফেরেশতাদের মধ্যে কেহ-কেহ তার বিশ্বস্ত অহিবাহক যারা নবীদের নিকট আল্লাহ্র মুখপাত্র হিসাবে তার আদেশ নির্দেশকে পৌঁছে দেন। কেহ-কেহ আল্লাহ্র সৃষ্টি রক্ষার কাজে নিযুক্ত। আবার কেহ-কেহ বেহেস্তের দরজার প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত। আরও অনেক আছে যাদের পদদ্বয় ভুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরে স্থিরভাবে স্থাপিত এবং তাদের শিরোদেশ আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে প্রসারিত এবং তাদের বাহু চতুর্দিকে সম্প্রসারিত। তাদের স্কন্ধ আরশের স্তম্ভের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের চোখ আরশের প্রতি নিবদ্ধ এবং তাদের পাখা আরশের নিচে বিস্তৃত। তারা তাদের নিজেদের মধ্যে এবং অন্য সকল কিছুর মধ্যে সম্মানিত পর্দা ও কুদরতের আবরন তৈরি করেছেন। তারা তাদের মহান স্রষ্টাকে আকৃতির মাধ্যমে ধারন করে না তারা স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির কোন গুনারোপ করে না, তাকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করে না এবং উপমার মাধ্যমে তার প্রতি ইঙ্গিত করে না।

আদম সৃষ্টি

আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি তা তোমরা জান না।'। (সুরা বাক্বারা : আয়াত ৩০)

মহান আল্লাহ কঠিন, কোম্‌ল, মধুর ও তিক্ত মৃত্তিকা সংগ্রহ করলেন। তিনি এই মৃত্তিকায় পানি দিয়ে কর্দমে পরিনত করলেন, ফোঁটায় ফোঁটায় পানির পতন ঘটালেন আঠাল না হওয়া পর্যন্ত এবং আদ্রতা দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করলেন। এ পিণ্ড হতে তিনি আদল, জোড়াসমুহ, অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ ও বিভিন্ন অংশ সহ একটি আকৃতি তৈরি করলেন। একটি নির্দিষ্ট সময় ও জ্ঞাত স্থায়িত্ব পর্যন্ত তিনি এটাকে শুকিয়ে কাঠিন্য প্রদান করলেন। অতঃপর এ আকৃতির মধ্যে তিনি তার রুহ ফুৎকার করে দিলেন। ফলে এটা প্রান-চৈতন্য লাভ করে মানব আকৃতি লাভ করল এবং এতে মন সন্নিবেশ করা হল যা তাকে নিয়ন্ত্রন করে, বুদ্ধিমত্তা দেয়া হল যা তার উপকারে আসে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেয়া হল যা তার কাজে লাগে, ইন্দ্রিয় দেয়া হল যা স্বাদ গন্ধ ও বর্ণ ও প্রকারের পার্থক্য বুঝাতে শেখালো এবং জ্ঞান দেয়া হল যা সত্য অসত্য বা ন্যায় অন্যায় উপলব্ধির মাধ্যমে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। আদম হল বিভিন্ন বর্ণের, আঠালো পদার্থের, বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী

উপকরনের এবং বৈশিষ্ট যেমন উষ্ণতা, শীতলতা, কোমলতা, কঠোরতা, সন্তুষ্টি- অসন্তুষ্টি ইত্যাদির সংমিশ্রনের কর্দম।

আল্লাহ যখন তার প্রতি ফেরেশতাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে, তার নির্দেশের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন, আত্মসমর্পণের স্বীকৃতি স্বরূপ ও তার মহিমার প্রতি সম্মান স্বরূপ সেজদাবনত হতে বললেন । আল্লাহ বলেন 'আদমকে সেজদা কর এবং ইবলিশ ব্যতীত সকলেই সেজদা করল। (সুরা বাক্বারা : আয়াত ৩৪) আত্মম্ভরিতা ইবলিশকে আল্লাহর আদেশ পালনে বাধা দিল এবং সে ঔদ্ধত্য দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সে আগুনের তৈরি বলে অহংবোধ করল এবং মাটির তৈরি বলে আদমের প্রতি অবজ্ঞাভরে ব্যাবহার করল। ফলে আল্লাহ ইবলিশকে তার অবাধ্যতার পূর্ণ প্রতিফল প্রদানের, মানুষকে পরীক্ষা করার ও শয়তানের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট সময় দিলেন। আল্লাহ বলেন 'সে বলল, আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে। তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আপনি যাদের কারণে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, অবশ্যই আমি আপনার সরল পথে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকব। তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পিছন থেকে, তাদের ডানদিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। তিনি বললেন, এখান থেকে বের হয়ে যাও ধিকৃত, বিতাড়িত অবস্থায়। মানুষের মধ্যে যারাই তোমার অনুসরণ করবে, অবশ্যই আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সুরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৪-১৮) অতঃপর আদমকে বেহেশতে অধিষ্ঠান করলেন যেখানে তিনি মহানন্দে ও পূর্ণ নিরাপত্তায় বসবাস করতে লাগলেন। তিনি আদমকে ইবলিশ ও তার শত্রুতা সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন। কিন্তু ইবলিশ আদমের বেহেশতে বাস ও ফেরেশতাদের সংসর্গের জন্য ঈর্ষান্বিত হল। তাই সে আদমের ইয়াকিন শিথিল করল এবং তার প্রতিশ্রুতি দুর্বল করল। এতে আদমের আনন্দ ভয়ে পরিনত হল এবং মর্যাদা পরিনত হল লজ্জায়। তখন আল্লাহ আদমকে তওবা করার সুযোগ দিলেন এবং তার রহমতের বাক্য শিখালেন। তিনি আদমকে বেহেশতে প্রত্যাবর্তনের ওয়াদা দিলেন এবং তাকে কষ্ট ভোগ করা ও বংশ বিস্তারের স্থলে অবতরন করালেন।

পয়গম্বর মনোনয়ন

আল্লাহ আদমের বংশধর হতে অনেক পয়গম্বর মনোনীত করলেন এবং তার প্রত্যাদেশ ও বানী বিশ্বস্ততার সাথে মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্য তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহন করলেন। কালক্রমে অনেক লোক আল্লাহ্কে দেয়া প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করে ফেললো এবং আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য বিষয় ভুলে গিয়ে তার সমকক্ষ দাঁড় করাতে লাগলো। শয়তান তাদেরকে আল্লাহ্র মারেফত তথা তার পরিচয় লাভ করা তথা তাকে জেনে বুঝে তার নৈকট্য লাভ করা থেকে ফিরিয়ে নিল ও তার ইবাদত হতে বিচ্ছিন্ন করলো। তখন আল্লাহ তাদের কাছে রাসুলগনকে প্রেরন করেন এবং একের পর এক নবী পাঠালেন যেন তারা পূর্ব প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ করার দিকে মানুষকে আহবান করেন, ভুলে যাওয়া নেয়ামত সমুহকে স্মরণ করিয়ে দেন, তবলিগের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে প্রণোদিত করেন, যেন তাদের কাছে প্রজ্ঞার গুপ্ত রহস্য উন্মোচন করে দেন এবং আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন সমুহ যেমন সমুচ্চ আকাশ, বিছানো পৃথিবী, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জীবনোপকরণ, মৃত্যু, বার্ধক্যের জরা ও ক্রমান্বয়ে আগত ঘটনা প্রবাহ তাদেরকে দেখিয়ে দেন।

আল্লাহ্ তার সৃষ্টিকে কখনও পয়গম্বর বিহীন অথবা নাজেলকৃত বানী অথবা বাধ্যতামূলক প্রত্যাদেশ অথবা সহজ সরল পথ ব্যতীত রাখেননি। পয়গম্বরগন এমনভাবে তাদের দায়িত্বে অটল ছিলেন যে, তাদের অনুসারীর সংখ্যাল্পতা বা তাদেরকে মিথ্যা প্রমাণকারীর দল অধিক হওয়া বা কোন কিছুই তাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নাই । পয়গম্বরগন প্রত্যেকেই তার পূর্ববর্তী জনের কথা বলে গেছেন এবং পরবর্তী জনের আগমনী বার্তা ঘোষণা করেছেন।

নবী মুহাম্মদ সঃ

এভাবে সময় গড়িয়ে যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হল, পিতারা মৃত্যুবরন করলো এবং সন্তানরা তাদের স্থানে এলো - সুদীর্ঘ সময় পার হবার পর আল্লাহ তার অঙ্গীকার পূরণে ও পয়গম্বর ধারা সমাপ্ত করে মুহাম্মদ সঃ কে নবী ও রসুল রুপে পৃথিবীতে প্রেরন করলেন। অন্যান্য পয়গম্বরগন হতে মুহাম্মদ সঃ সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহন করা হয়েছিল। মুহাম্মদ সঃ এর জন্ম ছিল অতি সম্মানজনক এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল সুখ্যাতিপূর্ণ। সে সময় পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন ধর্মে দলভুক্ত ছিল, তাদের মত ও পথ ছিল ভিন্ন, চিন্তাধারা ছিল বিক্ষিপ্ত এবং একে অপরের সাথে বিবাদমান ছিল।

তারা সৃষ্টিকে আল্লাহ্র সাথে সাদৃশ্য করতো অথবা তার মহিমান্বিত নাম সমুহ বিকৃত করতো অথবা তিনি ব্যতীত অন্য কিছুকে ক্রিয়া কর্মশীল মনে করতো। মুহাম্মদ সঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে সুপথ দেখালেন এবং তার অক্লান্ত প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি তাদেরকে অজ্ঞতা হতে ফিরিয়ে আনলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ মুহাম্মদ সঃ কে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মনোনীত করে তার মহিমান্বিত নৈকট্য দান করলেন এবং এ পৃথিবীতে থাকার অনেক উর্ধের মর্যাদাশীল বিবেচনা করে তাকে এই পৃথিবী হতে তুলে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলেন। ফলে তিনি মহা সম্মানের সাথে তাকে নিজের সান্নিদ্ধে নিয়ে গেলেন। মুহাম্মদ সঃ ও তার বংশধরদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত্ বর্ষিত হোক।

হজরত আলী ইবনে আবু তালিব (সুত্রঃ নাহাজুল বালাগা, অনুবাদঃ জেহাদুল ইসলাম)

আমরা জানি যেকোনো ভাষাতে সাধারণত একই শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। অন্যদিকে একই শব্দের আভিধানিক বা পারিভাষিক অর্থ আলাদাও হতে পারে। আমরা এখানে বিভিন্ন আরবি শব্দের বাংলা অর্থ ব্যাবহারের ক্ষেত্রে কোরআনের মুল ভাবার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ ব্যাবহার করব।

ঈমান শব্দের অর্থ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। **আকিদা** শব্দের অর্থ বলতে আমরা বুঝি যে মুল কিছু বিশ্বাস-মালা বা বিশ্বাসের বিষয়সমুহ যেগুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা। **আমল** শব্দের অর্থ কাজ এবং **ইবাদত** শব্দের অর্থ গোলামী বা দাসত্ব করা, আনুগত্য করা অর্থাৎ চিন্তা, কথা ও সকল কাজে আনুগত্য করা বা নির্দেশনা অনুসরন করা। মহান আল্লাহ বলেন,আমি জীন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি কেবল এ জন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে (যারিয়াত৫১/৫৬)" **ইসলাম** শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট নিজের আমিত্ব বা আত্মা কে সমর্পণ করা। **তাকওয়া** অর্থ আল্লাহ্প্রেম ও আল্লাহভীতি অর্থাৎ আল্লাহ্ কে সর্বাপেক্ষা (সকল কিছুর এমনকি নিজের চেয়েও অধিক) ভালবেসে তার সন্তুষ্টির পথে চলা এবং একই সাথে সর্বাপেক্ষা ভয় করে তার অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। মহান আল্লাহ বলেন 'হে মানব জাতি ,আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।(সুরা হুজরাত-১৩)। **দ্বীন** শব্দের অর্থ ধর্ম, প্রকৃতি, স্বভাব চরিত্র, স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এই সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কোরানে বলেন 'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন (ধর্ম, প্রকৃতি, স্বভাব চরিত্র,) ইসলাম (আত্মসমর্পণ) (সূরা আলে-ইমরান-১৯) পবিত্র কোরানে আল্লাহ অনেকবার দ্বীন শব্দ ব্যাবহার করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তার একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা প্রকৃতি বা স্বভাব চরিত্র ইসলাম বা আল্লাহ্র নিকট নিজের আমিত্ব বা আত্মা কে সমর্পণ করাই বুঝিয়েছেন। তিনি আরও বলেন "তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হয়? আল্লাহ্কেই সিজ্দা করে যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যমীনে, যত জীবজন্তু আছে সেসব এবং ফিরিশ্তাগণও, তারা অহংকার করে না। আর তারা ভয় করে তাদের উপর তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে"। (আন-নাহল;৪৮-৫০) এই মর্মে আল্লাহ আরও বলেন 'এরা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীনের সন্ধান করছে? অথচ আসমান ও যমীনে যা আছে সবই ইচ্ছেয় ও অনিচ্ছেয় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।' (সূরা আলে-ইমরান-৮৩) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তার সমগ্র সৃষ্টির প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে তারা সবাই (মানুষ ও জীন ছাড়া) আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে, তার প্রতি প্রতি সিজদাবনত হয় এবং তারা তাদের জন্য নির্ধারিত স্বভাবের বা পরিনতির বাইরে জেতে পারবেনা । যেমন সূর্য, চন্দ্র, সাগর, বাতাস, পশু, পাখি, গাছ্ ইত্যাদি সকল কিছু আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রকৃতির বিধানের বাইরে যেতে পারে না। এমনকি আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা উন্নত সৃষ্টি মানুষ বা তার পূর্বের উন্নত সৃষ্টি জীন তাদের জন্ম, মৃত্যু, আকৃতি বা চেহারা ইত্যাদির বিষয়ে কোন নিয়ন্ত্রন রাখে না। মানুষ বা জীন কে সীমিত যে স্বাধীনতা আল্লাহ্ দিয়েছেন তা হল হয় তাদের ধর্ম / প্রকৃতি / স্বভাব চরিত্র / স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যা ভাল ও খারাপের সমন্বয়ে তৈরি তা আল্লাহ্র নির্দেশনা অনুসারে পথ চলে তার মধ্যে যা কিছু খারাপ প্রকৃতি / স্বভাব চরিত্র আছে তা সংশোধন করে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ বা পবিত্র করে আত্মসমর্পণ করা বা আল্লাহ্র নিকট নিজের আমিত্ব কে সমর্পণ করে সফলকাম হওয়া অথবা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে আল্লাহ্র নির্দেশনা কে অমান্য করে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া। এছাড়াও মানুষ কে তিনি উদ্ভাবনী ক্ষমতা বা সৃষ্টিশীলতা দান করেছেন যার মাধ্যমে মানুষ সভ্যতার ক্রম বিকাশ সাধন করতে পারে আবার ধ্বংস যজ্ঞ ও করতে

পারে। এই মর্মে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :" তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে দ্বীন (ইসলাম)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর **ফিতরাত**, যার উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির রহস্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" -[সূরা রুমঃ আয়াত নং-৩০] "কেউ যদি ইসলাম (আত্মসমর্পণ) ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন (ধর্ম, প্রকৃতি, স্বভাব চরিত্র,) চায়, কখনোই তা গ্রহন করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" - (সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ৮৫) হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১০২-১০৩)

সকল নবিদের প্রচারিত ধর্ম ও ছিল ইসলাম (আত্মসমর্পণ)। এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন "তারা বলে- ইহুদী হও অথবা খৃষ্টান হও, তাহলে তোমরা হিদায়াত পাবে। আপনি বলুন! আমরা বরং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের দ্বীন অনুসরণ করব আর ইব্রাহীম মুশরিক ছিলেন না। তোমরা বল! আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আল্লাহ যা আমাদের প্রতি নাযিল করেছেন ও যা নাযিল করেছেন ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদের প্রতি আর মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রভুর নিকট থেকে যা দেয়া হয়েছে তার প্রতিও। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না আর আমরা তো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী বা মুসলিম। কাজেই তারাও যদি তোমাদের মত ঈমান আনে তাহলে তারাও হিদায়াত পাবে। আর যদি তারা ঈমান না এনে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা শত্রুভাবাপন্ন আর তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।" -(সূরা বাকারাহ ১৩০-১৩৪) মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সৃষ্টির আদি থেকে মানুষের জন্য একটি মাত্র ধর্মই আল্লাহ মনোনীত করেছেন তা হল ইসলাম (আত্মসমর্পণ)। বিভিন্ন যুগে আল্লাহ্র বিভিন্ন নবী বা রাসুল বা সতর্ককারীগন বিপথগামী মানুষকে সঠিক পথে তথা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণের পথে আহবান করেছেন। যাদের মাত্র কয়েকজনের নাম আল্লাহ্ কোরআনে উল্লেখ করেছেন। 'আমি তোমাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোনো জাতি নেই, যার মধ্যে সতর্ককারী আসেনি।' (সুরা ফাতির, আয়াত : ২৪),"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক"। সুরা আন-নাহলঃ ৩৬। আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রসূলের কাজ নয়। যখন আল্লাহর আদেশ আসবে, তখন ন্যায় সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সুরা মুমিন, আয়াত : ৭৮)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষের দ্বীন / ধর্ম / প্রকৃতি / স্বভাব চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন।

কাফের : কাফের শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী বা অবিশ্বাসী । যে আল্লাহ্কে বা আল্লাহ্র কোরান বা এর বিধান বা তার রাসুল বা প্রতিনিধিকে অবিশ্বাস করে বা অস্বীকার করে সে কাফির। এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়। তখন তুমি কাফেরদের চোখে-মুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারমুখো হয়ে উঠে। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা দোযখ, আল্লাহ কাফেরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা কতই না নিকৃষ্ঠ প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা হজ্জ : ৭২) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তদপরি আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায়। আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি, কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃত পক্ষে তারাই কাফের। আর যারা কাফের তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। (সূরা নিসা : ১৫০-১৫১) আমি তওরাত অবর্তীর্ন করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা আল-আনআম: ৪৪)

তবে কোন লোক কাফের হলেই তাকে হত্যা করা উচিত এই ধারনা পোষণ করা ভয়াবহ বিভ্রান্তি কারন আল্লাহ বলেছেন "এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার

জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। সুরা মায়েদা ৫:৩২ আর আল্লাহ তার রাসুল কে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কালীন বিধান সম্পর্কে বলেন 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে লড়াই করো, কিন্তু সীমা অতিক্রম করবে না। যারা সীমা অতিক্রম করে, তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ভালোবাসেন না। তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো। আর সেখান থেকে বের করে দাও, যেখান থেকে ওরা তোমাদেরকে একদিন বের করে দিয়েছিল। অন্যায় বাঁধা, নির্যাতন (ফিতনা) হত্যার চেয়েও খারাপ। তবে মসজিদুল হারাম-এর কাছে ওদের সাথে লড়াই করবে না, যদি না তারা সেখানে তোমাদের সাথে লড়াই শুরু করে। আর যদি তারা সেখানে লড়াই করেই, তাহলে তাদেরকে হত্যা করো অবিশ্বাসীদের এটাই উচিত প্রাপ্য। কিন্তু ওরা যদি (যুদ্ধ) বন্ধ করে, তবে অবশ্যই, আল্লাহ অনেক ক্ষমা করেন, তিনি নিরন্তর দয়ালু। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যায় বাধা, নির্যাতনের (ফিতনা) অবসান না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করে যাও। কিন্তু ওরা যদি (যুদ্ধ) বন্ধ করে, তাহলে কোনো বিরোধ থাকা যাবে না, শুধু মাত্র অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া। [আল-বাকারা ১৯০-১৯৩] এই আয়াতের অপ ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময় অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত লোকেরা অন্যায় হত্যার মত জঘন্য অপরাধ করেছে এবং এখনও করছে বিভিন্ন বিভ্রান্ত জঙ্গি গোষ্ঠী সমুহ। আবার বিভ্রান্ত খোদাদ্রোহী বা ইসলাম বিদ্বেষীরা এই আয়াতসমুহ কে পুরো পুরি না পরে বা বুঝে একে সংঘাতমূলক বা বিশ্বশান্তির পথে বাধা বলে মনে করে । আল্লাহ কোরআনে বলেন যে "হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশী ভালো জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে।" সুরা আন নাহল ১২৫। তাই সঠিক জ্ঞান ছাড়া কাউকে কাফির বলাও কঠিন গুনাহ কারন আল্লাহুর রাসুল সঃ বলেছেন যে ব্যক্তি কোন লোককে কাফির অথবা আল্লাহর শত্র" বলবে অথচ সে তা নয়, তাহলে বিষয়টি তার দিকে ফিরে যাবে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি বলেছে সে ব্যক্তিই কাফির বা আল্লাহর শত্র" হবে)।" (মুসলিম),

মুশরিকঃ শিরক' শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিছুতে কাউকে শরিক বা অংশীদার বানানো। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে মুশরেক বলা হয়, বাংলাতে 'মুশরেক ' শব্দের অর্থ করা হয় অংশীবাদী। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহ্ছ ছাড়া অন্য কারও বা কিছুর উপাসনা করা বা দাসত্ব করা বা আনুগত্য করাকে শিরক এবং এরূপ কারীকে মুশরিক বলে। আমরা সাধারনত প্রতিমা বা মূর্তি পুজা করাকেই শিরক' মনে করি। কিন্তু পবিত্র কোরান ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা শিরক' বা 'মুশরেক সম্পর্কে সচ্ছ ও সঠিক ধারনা পেতে পারি। "অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে ইবরাহীম ও তার সাথীদের সুন্দর আদর্শ, যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিল: আমরা তোমাদের এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অপরাপর উপাস্য দেবতাদের থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কমুক্ত, আমরা তোমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম, আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও ঘৃণার সম্পর্ক প্রকাশ হয়ে পড়ল, যে পর্যন্ত তোমরা শুধু এক আল্লাহর উপর ঈমান স্থাপন না করছ।" [সূরা আল-মুমতাহিনা: ৪] "আর নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এ কথা বলে যে, তোমরা শুধু আল্লাহর উপাসনা কর এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর।" [সূরা আন্-নাহল: ৩৬] 'বলে দাও, আমি কি তোমাদের এর চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব, যা আল্লাহর কাছে আছে? যাদের আল্লাহ লানত করেছেন ও যাদের ওপর তিনি ক্রোধান্বিত, আর যাদের মধ্য থেকে বাঁদর ও শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগুতের উপাসনা করে। তারা মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতর ও সরল পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।' (সুরা মায়েদা:৬০)। হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার এবাদত কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? [সূরা ইয়াসীনঃ ৬০-৬২] হে মানুষ নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে। আর প্রতারক (শয়তান) ও যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণায় ফেলতে না পারে।" [সূরা ফাতিরঃ ৫]। "যারা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, দুনিয়াতেই আমি তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দিব এবং তাতে তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র কম করা হবে না। এরা হল সেসব লোক, যাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছে সবই ধ্বংস হল এবং যে কর্ম করেছিল, তার সবই বাতিল।" [সুরা হূদঃ ১৫, ১৬]। "পার্থীব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতিত কিছুই নয়। পরকালের আবাসই পরহেযগারদের জন্য উত্তম। তারপরও তোমরা বুঝ না?" [সূরা আনআমঃ ৩২]। "পার্থিব জীবনের প্রতি কাফিরদের সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। তাই তারা মুমিনদের নিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু আল্লাহকে যারা ভয় করে চলে তারা কেয়ামত দিবসে তাদের উপরে অবস্থান করবে। আর জীবিকাতো আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব দান করেন।" [সূরা বাকারাঃ ২১২]। তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপমা

হলো বৃষ্টি, যার উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়। [সূরা হাদীদ : ৩০]। 'অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের নফসের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।' (সূরা আল-কাসাস: ৫০) 'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার নফসের খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না? (সুরা জাসিয়া: ২৩) তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই উপাস্য তিনি ব্যতীত' তাকে আমি শাস্তি দিব জাহান্নামে; এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি.।" (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ২৯) তুমি যদি শিরক কর, তাহলে তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা জুমার : ৬৫)। 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই (সূরা মায়িদা-৭২)। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমি অংশীবাদিতা (শিরক) থেকে সব অংশীদারের তুলনায় বেশি মুখাপেক্ষীহীন। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে এবং তাতে অন্যকে আমার সঙ্গে শরিক করে, আমি তাকে ও তার আমলকে বর্জন করি।' (মুসলিম)।
শিরক করার পর যে ব্যক্তি তা থেকে তওবা করবে না, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করার পাপ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন (সূরা নিসা, ৪৮)।

পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াত সমূহ থেকে আমরা এটা বুজতে পারি যে আল্লাহ ছাড়া বিভিন্ন দেব দেবীর বা তাগুত বা সমাজ বা শয়তান বা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য তথা অর্থ বা টাকার উপাসনা করা, প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা, নফসের খেয়াল-খুশী বা নিজ প্রবৃত্তির উপাসনা করা, রিয়া বা লোক দেখান আমল (কাজ) বা ইবাদত (আনুগত্য, গোলামি) তথা লোকের প্রশংসার তথা মানুষের উপাসনা করা, ইত্যাদি ছোট বা বড় শিরক' এর অন্তর্ভুক্ত। এখন যারা এইরূপ 'মুশরেক ' তারা যদি তওবা করে নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা না করে তাহলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তওবা সম্পর্কে বলেন "আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা করে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারপর সৎপথে অবিচল থাকে।"[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৮২]

"হে আল্লাহ! আমরা জানা অবস্থায় আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং অজানা অবস্থায় (শির্ক) হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।"

মুনাফিকঃ মুনাফিক শব্দের অর্থ হলো প্রতারক, ভণ্ড, কপট। যে প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী বলে দাবি করে এমনকি বাহ্যিকভাবে নামাজ, রোজা, হজ যাকাত ইত্যাদি পালন ও করতে পারে কিন্তু গোপনে বা অন্তরে বা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র প্রতি, বা তার রাসুলের প্রতি বা পবিত্র কোরানের প্রতি বা ইসলামের প্রতি কার্যত অবিশ্বাস লালন করে সে মুনাফিক।মুনাফিক সম্পর্কে আমাদের অনেকের ভ্রান্ত ধারনা আছে যে রাসুলের সময় অতি অল্প সংখ্যক লোক মুনাফিক ছিল এবং মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরানে মুনাফিক বলতে শুধু সেই নগণ্য সংখ্যক লোককে বুঝিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে রাসুলের যুগেও মুনাফিকের সংখ্যা খুব কম ছিলনা এবং তা আনুপাতিক হারে যে বেড়েছে সে সম্পর্কে আমরা একটি সচ্ছ ও সঠিক ধারনা পেতে পারি পবিত্র কোরান ও কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস এবং ইসলামের ক্রমবিকাশের সঠিক ইতিহাস ও বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ দাবিদারদের কার্যক্রম ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে। এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন 'মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পর অনুরূপ ভাবাপন্ন, তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভাল ও ন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হস্ত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। এ মুনাফিকরাই হল ফাসেক। এই মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহতায়ালা দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা চিরদিন থাকবে, ইহাই তাদের উপযুক্ত। তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।' (সূরা তওবা ৬৭ -৬৮) 'তারা (মুখে ঈমানের দাবীদার মুনাফিকরা) আল্লাহ ও ঈমানদারদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে চায়। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারছে না' 'এদের (মুনাফিকদের) মনের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের মিথ্যাবাদিতার কারণে তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি'(বাক্বারাহ ২/৯-১০) । রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেন, 'চারটি স্বভাব এমন যার সবগুলো কারো মধ্যে থাকলে সে পুরোদস্তুর মুনাফিক, আর যার মধ্যে তার কোনো একটি থাকবে, সে যতক্ষণ

তা পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাবই থাকবে। স্বভাব চারটি হচ্ছে- যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় সে তাতে খিয়ানত করে, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন কোনো ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন কারো সাথে ঝগড়া করে গালাগালি করে' (বুখারি ও মুসলিম)। মুনাফিকদের সম্পর্কিত এই আয়াত সমুহ বা এই সহিহ হাদিস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মুনাফিকির যে চারটি স্বভাব এর কথা সহিহ হাদিসে এসেছে তার প্রথমটি **আমানত সংক্রান্ত** । আমরা জানি যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও মালিক মহান আল্লাহ আমাদের মানুষ রুপে সৃষ্টি করেছেন বা জীবন দিয়েছেন শুধু তারই ইবাদত বা আনুগত্য করার জন্য। এবং সে অর্থে আমাদের জীবন পুরোটাই হল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের কে দেয়া আমানত । অতএব আমরা আমাদের জীবনে তার নির্দেশ অমান্য করলে প্রথমেই আল্লাহ্র কাছে আমানতের খেয়ানতকারি হয়ে যাব। এছাড়াও আমাদের বেক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রীয়, বৈশ্বিক সকল ক্ষেত্রে আমাদের উপর থাকা অর্থ বা দায়িত্ব সংক্রান্ত আমানত বিষয়ে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে আমরা আমানত খেয়ানত কারি হয়ে আংশিক বা পুরা মুনাফিক এ পরিণত না হই। দ্বিতীয়টি হল **মিথ্যা কথা বলা সংক্রান্ত**। মিথ্যা কথা বলা একটি মারাত্মক **মানসিক ব্যাধি** যা সংশোধন না করলে আমরা আল্লাহ্র কাছে আংশিক বা পুরা মুনাফিক রুপে পরিগণিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। তৃতীয়টি হল **ওয়াদা সংক্রান্ত।** আমরা জানি যে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন 'আর হে নবী! লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করিয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিলঃ নিশ্চয়ই তুমি আমাদের রব , আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি৷ এটা আমি এ জন্য করেছিলাম যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা না বলে বসো, আমরা তো একথা জানতাম না। (আরাফ ১৭২) অতএব আমরা যদি দুনিয়াতে আল্লাহ্কে প্রভু হিসাবে অস্বীকার করি বা তার নির্দেশ অমান্য করি তাহলে আমরা প্রথমেই আল্লাহর নিকট ওয়াদা ভঙ্গকারী হয়ে যাব। এছাড়াও আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রীয়, বৈশ্বিক সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশনা মেনে অতি সতর্কতার সাথে ওয়াদা করা ও তা রক্ষা করা উচিত যাতে আমরা ওয়াদা ভঙ্গকারী হয়ে আংশিক বা পুরা মুনাফিক এ পরিনত না হই । চতুর্থটি হল **গালাগালি বা মন্দ কথা বলা সংক্রান্ত।** পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম। (সূরা আল হুজরাত ১১) নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লঙঘন কারীদের পছন্দ করেন না। [সূরাঃআল-মায়ীদ [৮৭] আল্লাহ্র রাসুল সাঃ বলেছেন মুমিন কখনো দোষারোপকারী, অভিশাপদাতা, অশ্লীলভাষী ও গালাগালকারী হয় না। (তিরমিজি, হাদিস : ২০৪৩) অনেক মানুষই ঝগড়া করলে বা কার উপর রাগ করলে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে গালাগালি করে বা মন্দ কথা বলে বা বেক্তিগত আক্রমণ করে কথা বলে । আমাদের উচিত তওবা করে আত্ম সংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করে সংযত কথা বলা বা আচরন করা অন্যথায় আমরা আল্লাহ্র কাছে আংশিক বা পুরা মুনাফিক রুপে পরিগণিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

পবিত্র কোরান ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এইটুকু উপলব্ধি করতে পারি যে অধিকাংশ মানুষই (ইসলাম ধর্মের অনুসারি দাবিদার সহ) দ্বীনের বা ধর্মের বা স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে কাফের (অস্বীকারকারী বা অবিশ্বাসী), মুশরিক (অংশীবাদী), মুনাফিক (প্রতারক, ভণ্ড, কপট) তথা জালেম (অত্যাচারী) বা ফাসেক (পাপীষ্ঠ) তথা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন আমি অবশ্যই মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন প্রকার উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্য প্রত্যাখ্যান ব্যতীত ক্ষান্ত হল না। (সূরা বনী ইসরাঈল ৮৯) 'মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।' (সূরা আসর) আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিনত করতে পারতেন আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না। তোমার পালনকর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার আল্লাহর কথাই পূর্ণ হবে যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব। (সুরা হুদ ১১৮-১১৯) আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। তাদের উদাহরণ অতি

নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে / অস্বীকার করেছে আমার আয়াত সমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। যাকে আল্লাহ পথ দেখাবেন, সেই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে তিনি পথ ভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। [(সূরা আরাফ ১৭৫ - ১৭৯] নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর জুলুম করেন না, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে। [সুরা ইউনুস ১০:৪৪] আর আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। অতঃপর যখন আপনার রবের নির্দেশ আসল, তখন আল্লাহ ছাড়া তারা যে ইলাহসমূহের ইবাদাত করত তারা তাদের কোন কাজে আসল না। আর তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের অন্য কিছুই বৃদ্ধি করল না। [সুরা হুদ ১০১] আর তারা কুটকৌশল করেছিল আল্লাহও কৌশল করেছিলেন; আর আল্লাহ **শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।** (সূরা আল ইমরান ৫৪) আর আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন এবং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফয়সালা করেন, আর তিনিই **সর্বোত্তম ফয়সালাপ্রদানকারী / বিচারক।** [সুরা ইউনুস ১০:১০৯] আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। [সুরা আম্বিয়া ২১:৪৭]

পবিত্র কোরান ও কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস অনুযায়ী প্রত্যেক আদম সন্তানকে তার কেয়ামতের দিন অর্থাৎ তার মৃত্যুর সাথে সাথে তাকে তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ১.**তোমার প্রতিপালক কে?** ২.**তোমার দ্বীন বা ধর্ম বা স্বভাব চরিত্র কী ছিল** ৩. **মহানবী স. কে দেখিয়ে বলা হবে এ ব্যক্তিটি কে**?

এখন যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রভু বা ইলাহা বা উপাস্য হিসাবে আল্লাহ্ বেতিত অন্য কিছুকে বা কাউকে গ্রহন করেছেন বা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করেছেন তথা শির্ক বা অংশীদার, কুফর বা অস্বীকার, নিফাক বা কপটতার এর মধ্যে ডুবে ছিলেন তাহলে তিনি প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই আমানত খেয়ানত কারি এবং ওয়াদা ভঙ্গকারী প্রমানিত হবেন কারন দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই আমরা সবাই আল্লাহ্র কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম যে তিনিই আমাদের রব বা প্রভু এবং তিনি আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন । আর ২য় প্রশ্নের উত্তরে যারা দ্বীনের বা ধর্মের বা স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে কাফের (অস্বীকারকারী বা অবিশ্বাসী), মুশরিক (অংশীবাদী), মুনাফিক (প্রতারক, ভণ্ড, কপট) তারা নিজেদেরকে ইসলাম বা আত্মসমর্পণ ধর্মের অনুসারী বা মুমিন (বিশ্বাসী) বা মুত্তাকি (আল্লাহ্প্রেমী ও আল্লাহভীতিসম্পন্ন) বা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) দাবি করতে পারবেনা। আর ৩য় প্রশ্নের উত্তরে যারা আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে তার রাসুলের অনুসরণ করেছেন তারা বেতিত যারা জালিম বা ফাসেকদের অনুরসন বা অনুকরন করেছেন তারা এইখানেও সফল হবেন না অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবেন। মৃত্যু পরবর্তী এই প্রশ্ন বা প্রত্যেক মানুষের দুনিয়াতে করা সকল আমলের বা কাজের তথা তার মৃত্যুর পূর্বের সর্বশেষ **দ্বীন বা ধর্ম বা স্বভাব চরিত্র** এর মূল্যায়ন এবং তার ফলাফল অনুসারে পরবর্তী গন্তব্য বা অবস্থান বা শাস্তি বা পুরস্কার সকল মানব আত্মার জন্য একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয় অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া থেকে কোন বেক্তিকে অব্যাহতি দেয়া হবে অথবা বিনা হিসাবে বেহেশতে নেয়া হবে এমন কথা আল্লাহ্ কোরআনের কোথাও বলেন নাই। অতএব এইরূপ ধারনা যদি কারও থেকে থাকে তবে তা পবিত্র কোরআনের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক একটি ধারনা।

এইরূপ ভয়াবহ ভীতিকর অবস্থার মধ্যে আমাদের সকলের মানুষ হিসাবে (ইসলাম ধর্মের অনুসারি দাবিদার সহ) প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল আত্ম পরিচয় অনুসন্ধান করা তথা আমাদের দ্বীনে বা ধর্মে বা স্বভাব চরিত্রের মধ্যে কতটুকু কুফরি (অবিশ্বাস বা অস্বীকার), মুশরিকি (অংশীবাদীতা) বা মুনাফেকি (কপটতা) আছে তা উপলব্ধি করা এবং আল্লাহ্র কাছে দয়া ভিক্ষা চেয়ে, ক্ষমা প্রার্থনা করে, তওবা করে, জিহাদে আকবর বা কঠিন প্রচেষ্টা বা কঠিন সাধনার মাধ্যমে, ধৈর্যশীল হয়ে, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি প্রার্থনার মাধ্যমে নিজের দ্বীন বা ধর্ম বা স্বভাব চরিত্র সংশোধন করে মুমিনদের (বিশ্বাসীদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে অতঃপর মুত্তাকীদের (আল্লাহ্প্রেমী ও আল্লাহভীতিসম্পন্ন দের) বা মুসলমানদের (আত্মসমর্পণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাতে করে আমরা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি থেকে তথা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাই। আমরা আল্লাহ্র কাছে দয়া ভিক্ষা চাই 'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ই যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু। বিচার দিনের একমাত্র অধিপতি। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের সরল পথ দেখাও। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (সুরা ফাতেহা)

মুমিনঃ মুমিন শব্দের অর্থ বিশ্বাসী বা বিশ্বাস স্থাপন কারি। যে ব্যক্তি ইসলাম (আত্মসমর্পণ) ধর্মের বা স্বভাব চরিত্রের উপর ইমান বা দৃঢ় বিশ্বাস এনেছে তাকে মুমিন বলে। মুমিনদের ঈমান (বিশ্বাস) বা তাকওয়া (আল্লাহ্প্রেম ও আল্লাহভীতি) এর স্তর বিন্যাস আছে অর্থাৎ সকলের মর্যাদা সমান নয়। পবিত্র কোরআনের আলোকে মুমিনদেরকে তাকওয়ার দিক থেকে মোটামুটি দুই ভাগ করা যায়। যেমন প্রাথমিক মুমিন এবং প্রকৃত মুমিন বা সফল মুমিন বা মুত্তাকি (আল্লাহ্প্রেমী ও আল্লাহ্ ভয়কারী)। এদের মধ্যে প্রাথমিক মুমিনদের অবস্থা তুলনামুলক ভাবে কম স্থিতিশীল। তাদের আল্লাহ্র কাছে দয়া ভিক্ষা চেয়ে, ক্ষমা প্রার্থনা করে, তওবা করে, জিহাদে আকবর বা কঠিন প্রচেষ্টা বা কঠিন সাধনার মাধ্যমে, ধৈর্যশীল হয়ে, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি প্রার্থনার মাধ্যমে নিজের দ্বীন বা ধর্ম বা স্বভাব চরিত্র সংশোধন করে পরবর্তী স্তর তথা প্রকৃত মুমিন বা সফল মুমিন বা মুত্তাকি (আল্লাহ্প্রেমী ও আল্লাহ্ ভয়কারী) স্তরে পৌঁছানোর জন্য সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে অন্যথায় তাদের পদস্খলন বা পথভ্রষ্ট হয়ে পুনরায় কাফের (অস্বীকারকারী বা অবিশ্বাসী), মুশরিক (অংশীবাদী), মুনাফিক (প্রতারক, ভণ্ড, কপট) স্তরে পৌঁছানোর নিশ্চিত সম্ভবনা আছে। এটি অবশ্যই একটি সার্বক্ষণিক চলমান প্রক্রিয়া যা সকল স্তরেই অনুসরন করা আবশ্যক। অন্যথায় নিশ্চিতভাবেই পদস্খলন বা পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আমাদের অনেকের ভ্রান্ত ধারনা আছে যে রাসুল সঃ এর জীবদ্দশায় যারা ঈমান এনেছিলেন, আমরা যাদের রাসুলের সাহাবী বা সাথি বলি তাদের সবার মর্যাদা বা তাকওয়া সমান বা তাদের সবাইকে আল্লাহ্ বিনা হিসাবে বেহেশতে নিবেন শুধু তার প্রিয় নবী সঃ এর সহবতের অসিলায়। এটি পবিত্র কোরআনের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক একটি ধারনা কারন সাহাবিদের মর্যাদার পার্থক্য নিয়ে আল্লাহ্ বলেন 'তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? অথচ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের (হুদাইবিয়ার সন্ধি) পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে (তারা এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।' (সূরা আল হাদীদ ১০) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানছেন! (সূরা আলে-ইমরান ১৪২) ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে আল্লাহ্ বলেন 'অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সাথে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কিছু সংখ্যক দুনিয়া চাচ্ছিল এবং কিছু সংখ্যক চাচ্ছিল আখেরাত। তারপর তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তাদের (তোমাদের শত্রুদের) থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের (পাহাড়ের) দিকে ছুটছিলে এবং পিছন ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূল তোমাদেরকে পিছন দিক ডাকছিলেন। ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ এবং যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে তন্দ্রারূপে প্রশান্তি, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে, আমাদের কি কোন কিছু করার আছে? বলুন, সব বিষয় আল্লাহরই ইখতিয়ারে। যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে সেগুলো গোপন রাখে। তারা বলে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলুন, যদি তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশোধন করেন। আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে অবগত।যেদিন দু' দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের ফলে শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল। (সূরা আলে-ইমরান ১৫২-১৫৫) এই আয়াত সমুহে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনার মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহ্র দয়ায় এইটুকু বুঝি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একেবারেই প্রাথমিক যুগের সাহাবাদের মধ্যে যারা দুনিয়া চাচ্ছিল বা যারা রাসুলের নির্দেশ অমান্য করে গনিমতের মাল সংগ্রহ করেছিলেন বা রাসুলের ডাক উপেক্ষা করে, তাকে অরক্ষিত ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন তাদের ঈমান ও তাকওয়া ও যারা আখেরাত চাচ্ছিল বা রাসুলের নির্দেশ মান্য করেছিলেন এবং উক্ত জিহাদে শহীদ হয়েছিলেন বা তাকে রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে যুদ্ধ করেছিলেন তাদের ঈমান ও তাকওয়া কোনক্রমেই এক না এবং আল্লাহ্ অবশ্য তাদেরকে ক্ষমা করেছেন তাদের এই পদস্খলন এর জন্য তবে মহান আল্লাহ্ কাহারও সকল পদস্খলন সর্বদা ক্ষমা করবেন এমন কথা কখনও কোরআনের কোথাও বলেন নাই। আল্লাহ্ বলেন 'যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে সেকি তার মত যে আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছে ? আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কতই না মন্দ

প্রত্যাবর্তনস্থল! তারা আল্লাহর নিকট বিভিন্ন মর্যাদার। আর তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (সুরা আলে-ইমরান ১৬২-১৬৩) এছাড়াও আল্লাহ্ সাহাবীদের তাকওয়ার স্তরবিন্যাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী এবং প্রথম স্তরের (তাকওয়ার দিক থেকে) আর যারা তাদেরকে যাবতীয় সৎকর্মে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হল মহান সফলতা। আর তোমাদের মরুবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদেরকে জাননা, আমিই তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর অপর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকাজের সাথে অন্য অসৎকাজ মিশিয়ে ফেলেছে: আল্লাহ **হয়ত** তাদেরকে ক্ষমা করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদের সম্পদ থেকে সদাকাহ গ্রহণ করবে যাতে তা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পার। তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে, বস্তুতঃ তোমার দু'আ তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক, আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন সব কিছু জানেন। তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের (অনুশোচনাপূর্ণ) ক্ষমাপ্রার্থনা কবুল করে থাকেন আর সদাকাহ গ্রহণ করেন। আর আল্লাহই তো তাওবাহ কবূলকারী, অতি দয়ালু। আর বল, 'তোমরা আমল কর। অতএব, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা তোমরা আমল করতে সে সম্পর্কে'।আর কতক আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষায় থাকল, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদের তাওবাহ কবূল করবেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, বড়ই প্রজ্ঞাময়। (সূরাঃআত-তাওবা ১০০ - ১০৬)

আর শুধু মুখে বললেই যে কেউ মুমিন বা বিশ্বাসী হয় না এই মর্মে আল্লাহ বলেন 'মরুবাসীরা বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুনঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বাহ্যিক ভাবে বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিস্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (সূরা আল হুজরাত ১৪) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। [সুরা আনকাবুত ২-৪] 'যারা ঈমান আনার পর কুফরী করল, তারপর তাদের কুফরী বেড়েই চলল, তাদের তাওবাহ কখনো কবুল করা হবে না এবং এ লোকেরাই পথভ্রষ্ট। যারা কুফরী করে এবং সেই কাফির অবস্থায়ই মারা যায়,তাদের কেউ পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও বিনিময়স্বরুপ প্রদান করতে চাইলে তা তার কাছ থেকে কখনো গ্রহন করা হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' (সূরা: আলে- ইমরান, আয়াত: ৯০-৯১)।'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না।' (বাকারা ১৮৮) 'যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দেয়। এটা এই জন্য যে তারা বলে বেচাকেনা তো সুদেরই মত।' (বাকারা ২৭৫) 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে অতঃপর যে বিরত রয়েছে তার অতীতের কার্যকলাপ তো পেছনেই পড়ে গেছে এবং তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ার।' (বাকারা ২৭৫) হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয় করার শর তো কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন কর-যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে। তবে কি তোমরা বিরত হবে না? (মায়েদাহ ৫/ ৯০- ৯১) তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।(বাকারা ১৫২) স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নি'য়ামাত) বৃদ্ধি করে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও (তবে জেনে রেখ, অকৃতজ্ঞদের জন্য) আমার শাস্তি অবশ্যই কঠিন। (সূরা ইব্রাহীম ৭) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু না কিছু দিয়ে পরীক্ষায় ফেলবোই: মাঝে মধ্যে তোমাদেরকে বিপদের আতঙ্ক, ক্ষুধার কষ্ট দিয়ে, সম্পদ, জীবন, পণ্য-ফল-ফসল হারানোর মধ্য দিয়ে। আর যারা **কষ্টের মধ্যেও ধৈর্য-নিষ্ঠার সাথে** চেষ্টা করে, তাদেরকে সুখবর দাও। [আল-বাক্বারাহ ১৫৫] প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর জীবন ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী। -(সূরা আল হুজুরাতঃ ১৫) প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের বিশ্বাস বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে। তারা নামায কায়েম

করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। এ ধরনের লোকেরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের (আল্লাহর) কাছে রয়েছে বিরাট মর্যাদা, ভুল-ত্রুটির ক্ষমা ও উত্তম রিযিক। - (সূরা আল আনফালঃ ২-৪) মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভাল কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই। অবশ্যই আল্লাহ সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। -(সূরা তাওবাঃ ৭১) পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো এবং (আখেরাতে) তাদের প্রতিদান দেবো **তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে**।- (সূরা আন্ন নহলঃ ৯৭) 'মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়ী-নম্র, যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত, যারা জাকাত দান করে থাকে এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থান সংযত রাখে, নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।.অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারাই হবে সীমালংঘনকারী, যারা **আমানত ও অঙ্গীকার** সম্পর্কে সাবধান থাকে এবং যারা তাদের নামাজসমূহে যত্নবান থাকে।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ১-৯) 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।(সূরা নুর: ৩০-৩১) হে বনী আদম! অবশ্যই আমরা তোমাদের জন্য পোষাক নাযিল করেছি, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকা ও বেশ-ভূষার জন্য। আর **তাকওয়ার পোষাক, এটাই সর্বোত্তম**।এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা আল-আ'রাফ: ২৬) নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ইমানদার পুরুষ, ইমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকরকারী পুরুষ ও জিকরকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।' (সুরা আহজাব : ৩৫)। হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর **তাকওয়া (আল্লাহ্‌প্রেম ও আল্লাহভীতি)** অবলম্বন কর তবে তিনি তোমাদেরকে **ফুরকান তথা ন্যায়-অন্যায়** পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্‌ মহাকল্যাণের অধিকারী। (আল-আনফাল ২৯) পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়, কিন্তু সৎকর্ম হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনবে আর সম্পদ দান করবে **তাঁর ভালবাসায়** আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে। তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং **তারাই মুত্তাকী (আল্লাহ্‌প্রেমী ও আল্লাহভীতিসম্পন্ন)।** [সুরা বাকারা ২:১৭৭]

পবিত্র কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু সহিহ হাদিস যাতে রাসুল সঃ বলেছেনঃ

আমার প্রভু আমাকে নয়টি নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলো হলো :

গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে,সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে ন্যায় কথা বলতে,দারিদ্র ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থাতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে,যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক জুড়তে,যে আমাকে বঞ্চিত করে, তাকে দান করতে, যে আমার প্রতি অবিচার করে, তাকে ক্ষমা করে দিতে, আমার নীরবতা যেন চিন্তা গবেষণায় কাটে, আমার কথাবার্তা যেনো হয় উপদেশমূলক, আমার প্রতিটি দৃষ্টি যেনো হয় শিক্ষা গ্রহণকারী।

এ ছাড়া ও আমার প্রভু আমাকে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো হলো :

আমি যেনো ভালো কাজের আদেশ করি এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করি। (বুখারী)

‘তোমরা কি জানো অভাবী কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে তো সেই অভাবী যার টাকা-পয়সা ও অর্থ-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশি অভাবী হবে, যে দুনিয়াতে সালাত, সিয়াম, জাকাত আদায় করে আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল-সম্পদ আত্মসাত করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে আবার মেরেছে। সুতরাং এই হকদারকে তার নেকী দেয়া হবে। আবার ঐ হকদারকেও (পূর্বোক্ত হক্বদার যার ওপর জুলুম করেছিল) তার নেকী দেয়া হবে। এভাবে পরিশোধ করতে গিয়ে যদি তার (প্রথম ব্যক্তির) নেকী শেষ হয়ে যায় তবে তাদের (পরের হক্বদারের) গুণাহসমূহ ঐ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম- ৬৪৭৩)

গোটা সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের জন্যে বেশী উপকারী, সে তাঁর কাছে বেশী প্রিয়। (মুসলিম)

আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখাবার নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসলিম)

‘যে ব্যক্তি কথায় অধিক সত্যবাদী, আমানত রক্ষায় অধিক সতর্ক, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অধিক ওয়াফাদার, যার চরিত্র অধিক উত্তম এবং তোমাদের মধ্য হতে জনগণের সাথে যার সম্পর্ক অতি নিকটের, সে কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য হতে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি’।

“কোন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাই শোনে তাই যাচাই না করেই অন্যের কাছে বর্ণনা করে দেয়।” (মুসলিম)

আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গোনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? তিনি বললেন, মিথ্যা কথা বলা কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (মুসলিম- ১৬২) মিথ্যা সাক্ষি দেয়া এত বড় গুনাহ যে তা শিরকের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

ঈমানের পূর্ণতা লাভকারী মুমিন তারা,যাদের নৈতিক চরিত্র সর্বোত্তম। [মিশকাত)

শ্রেষ্ঠ আমল হলো, আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যে ঘৃণা করা। (আবু দাউদ)

পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করিও না, পরস্পরে ঈর্ষা পোষণ করিও না, একে অন্যকে হিংসা করিও না এবং হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা সকলে ভাই ভাই হইয়া বাস কর।" (বোখারী)

নিজের জন্যে যা পছন্দ করো, অন্যদের জন্যেও তাই পছন্দ করবে, তবেই হতে পারবে মুমিন। (মুসলিম)

তোমাদের কেউ মুমিন হবেনা , যতোক্ষণ সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে , তার ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ না করবে । [বুখারী]

যে বান্দা অন্য বান্দার দোষ ত্রুটি এই পার্থিব জীবনে গোপন রাখে মহান আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন’ (মুসলিম)

প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জবান (কথা) ও হাত থেকে অন্য ব্যক্তি নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা সে পরিত্যাগ করে। (বুখারী- ৬৪৮৪)

যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো উত্তম কথা বলে। (সহীহ বুখারী) তোমার ভাইয়ের দিকে হাসি মুখে তাকানো একটি দান। (তিরমিযী) তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ তারা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। (ইবনে মাজাহ)

যে কাউকেও প্রতারণা করলো সে আমার লোক নয়। তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করোনা, ঘৃণা বিদ্বেষ কারো না এবং পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়োনা। (মুসলিম)

তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করোনা। (তিরমিযী) কোনো নিন্দুক জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (বুখারী)

যার মনে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (মুসলিম)

বিনয় এবং সততা ইমানের অঙ্গ। কর্মে এবং চিন্তায় যে সৎ,সেই প্রকৃত সৎ মানুষ।

তোমাদের মাঝে সালাম আদান প্রদানের ব্যাপক প্রচলন করো। (মুসলিম)

আল্লাহর সিদ্ধান্ত সন্তুষ্ট থাকতে পারা আদম সন্তানের একটি সৌভাগ্য। (তিরমিযী)

আল্লাহ তোমার ভাগে যা রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকো, তবেই হবে সবচেয়ে প্রাচুর্যশালী। (মিশকাত)

আল্লাহ্বর কসম সে মুমিন নয় আল্লাহ্বর কসম সে মুমিন নয় আল্লাহ্বর কসম সে মুমিন নয় যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দর সহানুভূতির আচরণ করো, তবেই মুমিন হবে। (মিশকাত)

সে মুমিন নয়, যে নিজে পেট পূরে খায় আর পাশেই তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে। (বায়হাকী)

অধীনস্থদের সাথে নিকৃষ্ট আচরণকরী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (আহমদ]

শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পাওনা পরিশোধ কর।

শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। (মুসলিম) "অশ্লীলভাষী ও উগ্রমেজাজী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। অধীনস্থদেরকে ধোঁকাদানকারী শাসক জান্নাতে যাবে না। অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী জান্নাতে যাবে না। খোটাদানকারী, অবাধ্য সন্তান ও মদ্যপ জান্নাতে যাবে না

হারাম থেকে বেঁচে থাকো, আল্লাহ তোমাকে হিফাযত করবেন। (তিরমিযী)

"যে গোশত হারাম থেকে গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। যে সকল গোশত হারাম মাল থেকে গঠিত তার জন্য দোযখই শ্রেষ্ঠ স্থান।

যে বেক্তি দোষ যুক্ত জিনিস বিক্রি করে খরিদ্দারকে তার দোষের কথা ইচ্ছা করে গোপন করে আল্লাহ্ব তার উপর অসন্তুষ্ট হন ও ফেরেস্তারা তাকে আভিসম্পাত দিতে থাকে।

'যে ব্যক্তি পণ্য আমদানি করে বাজার দামে বিক্রয় করে, তার উপার্জনে আল্লাহর রহমত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আমদানি করে চড়া দামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য মজুদ করে রাখে, তার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।'

লোক দেখান নামাজ পরা, রোজা রাখা ও দান করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও দান করে বলে বেড়ায় এই ধরনের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

যার মধ্যে আমানত নেই তার ঈমান নেই। (মিশকাত) অনাড়ম্বর জীবন যাপন ঈমানের অংশ। (আবু দাউদ)

মযলুমের ফরিয়াদ থেকে আত্মরক্ষা করো। (বুখারী) যুলম করা থেকে বিরত থাক। কেননা, কিয়ামতের দিন যুলম অন্ধকারের রূপ নেবে। (মুসলিম)

মনের মধ্যে লোহার মতোই মরিচিকা পড়ে।। আর তা দূর করার উপায় হলো ক্ষমা প্রর্থনা করা। (বায়হাকী)

মর্যাদা অনুযায়ী মানুষকে সমাদর করো। (আবু দাউদ) 'যারা ছোটদেরকে স্নেহ করেনা এবং বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান দেখায় না, তারা আমাদের হতে নয়'

নিশ্চয়ই সূদ এমন বস্তু যার পরিণাম হচ্ছে সংকুচিত হওয়া যদিও তা বৃদ্ধি মনে হয়। (ইবনে মাজাহ)

রোজা, নামাজ দান খয়রাতের চেয়ে ভাল কাজ কি জান ? সেটা হল পারস্পারিক বিরোধ নিষ্পত্তি করে দেয়া । আর পারস্পারিক সম্পর্ক নষ্ট করা এমনই খারাপ গুনাহ যার দ্বারা সকল কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

মুসলমান : মুসলমান শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী বা আমিত্ব কে সমর্পণকারী । ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহ্র নিকট নিজের আমিত্ব বা আত্মা কে সমর্পণ কারীকে মুসলমান বলে। এটি দ্বীনের বা ধর্মের বা স্বভাব চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। এই মর্মে আল্লাহ বলেন ' আর তার অপেক্ষা দ্বীনে / ধর্মে / স্বভাব চরিত্রে কে উত্তম, যে বিশুদ্ধ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (সুরা -নিসা, ৪/১২৫) আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে আহবান জানায় এবং সৎকাজ করে। আর বলে, অবশ্যই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরাঃ হা-মীম আস-সাজদা ৩৩) হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১০২-১০৩) হাঁ, যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছে আর সে সৎকর্মশীলও হয়েছে তবে তার জন্য তার রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই আর তারা চিন্তিত হবে না। আল-বাকারা, ২/১১২ হজরত ইব্রাহিম আঃ থেকে শুরু করে সকল নবী, রাসুল, সতর্ককারী, আহলে বায়াত, তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রবর্তী ও প্রথম স্তরের সাহাবীগন, রাসুলের বংশের ইমামগন, আল্লাহ্র অলি বা আলেম প্রমুখ মুসলমান বা আত্মসমর্পণকারী স্তরের বান্দা । তাদের মধ্যে নবী একটি সর্বোচ্চ মর্যাদার উপাধি । পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েকজন নবির নাম আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন যাদের মধ্যে আদম (আ.), শিশ ইবনে আদম (আ.) ইদরিস (আ.) নুহ (আ.) হুদ (আ.) সালেহ (আ.) ইবরাহিম (আ.) লুত (আ.) শোয়াইব (আ.) ইসমাঈল (আ.) ইসহাক (আ.) ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.), আইয়ুব (আ.), জুলকিফল (আ.), ইউনুস (আ.), মুসা (আ.), হারুন (আ.), ইউশা ইবনে নুন (আ.), ইলিয়াস (আ.), দাউদ (আ.), সোলাইমান (আ.), জাকারিয়া (আ.), ইয়াহইয়া (আ.) ও ঈসা (আ.) এর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পবিত্র কোরআনে ওযায়ের (আ.) খিযির (আ.), লোকমান হাকীম (আ.) প্রমুখ আল্লাহ্র বিশেষ বান্দার নাম এসেছে যারা নবী না হলেও আল্লাহ্র অলি বা আলেম মর্যাদার আত্মসমর্পণকারী স্তরের বান্দা ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। আর মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী যাকে মহান আল্লাহ্ সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে এবং রহমাতাল্লিল 'আলামিন বা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত বা দয়া স্বরূপ পাঠিয়েছেন যার উপর আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন ও তিনি মুমিনদেরকেও তার উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে বলেছেন । পবিত্র কোরানে আমরা দেখি যে অধিকাংশ নবিগনের উত্তরসূরি নবীগণ ছিলেন তাদের পূর্ববর্তী নবীগণের পুত্র বা ভাই তথা তাদের বংশধর বা পরিবার ভুক্ত ব্যক্তি । এই মর্মে আল্লাহ বলেন "নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আঃ), নূহ (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর এবং এমরানের বংশকে নির্বাচিত করেছেন।"সুরা আল- ইমরানঃ আয়াত-৩৩। 'যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।' সুরা আল-বাকারা, ২/১২৪ । আমরা জানি হজরত ইবরাহিম (আ.) এর পুত্র ইসমাঈল (আ.) এর বংশধর ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ)। এছাড়াও ইবরাহিম (আ.) এর পুত্র হজরত ইসহাক্ব (আঃ) এর বংশ থেকে ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.) প্রমুখ নবীদের আবির্ভাব।

সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আল্লাহ্ ইব্রাহিম আঃ ও মুহাম্মদ সঃ এর বংশধরদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। তাই তিনি আমাদের দৈনিক সালাত বা নামাজে দরুদে ইব্রাহীমে (হে আল্লাহ শান্তি বর্ষণ কর মুহাম্মদ সা. এর উপর এবং মুহাম্মদ সা. এর পরিবারবর্গের উপর । যেমনি ভাবে শান্তি বর্ষণ করেছ ইব্রাহীম আ. এর উপর এবং ইব্রাহীম আ. এর পরিবার বর্গের উপর। নিশ্চই তুমি প্রশংসিত # হে আল্লাহ বরকত দান কর মুহাম্মদ সা. এর উপর এবং মুহাম্মদ সা. এর পরিবার পরিজনের উপর। যেমনি বরকত দান করেছ ইব্রাহীম আ.এর উপর এবং ইব্রাহীম আ. এর পরিবারপরিজনের উপর। নিশ্চই তুমি প্রশংসিত) তাদের প্রতি অর্থাৎ ইব্রাহিমের আঃ বংশের আত্মসমর্পণকারী স্তরের নবী অথবা অলি বা আলেম এবং মুহাম্মদ (সঃ) এর আহলে বায়াত ও আত্মসমর্পণকারী স্তরের ইমাম অথবা অলি বা আলেম দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় নামাজই সম্পূর্ণ হবে না। তবে এই বংশের জালিমগন বা অত্যাচারীগন আল্লাহ্র অঙ্গীকার অনুযায়ী এই মর্যাদার অন্তরভুক্ত হবে না।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের এই বিধান অনুযায়ী সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রকৃত উত্তরসুরি বা উম্মাতে মুহাম্মাদীদের মধ্যেও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হল তার আহলে বায়াত বা রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়। তারা হলেন হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। উল্লেখ্য রাসুলের (সঃ) তথা আহলে বায়াত এর বংশ থেকেই শেষ যুগে ইমাম মেহেদী আঃ আসবেন। এছাড়াও রাসুলের (সঃ)

বংশধর ইমাম জয়নাল আবেদিন , ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকের, ইমাম জাফর সাদেক, ইমাম মুসা আল কাজিম, ইমাম আলী রেজা, ইমাম মুহাম্মাদ আল তাক্কি, ইমাম আলী আন নাক্কি ও ইমাম হাসান আল আসকারি তাঁরা সবাই ছিলেন আত্মসমর্পণকারী স্তরের স্ব স্ব যুগের ঈমাম বা ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতার তথা তাকওয়ার (আল্লাহ্প্রেম ও আল্লাহ্ ভীতির) সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র। আহলে বায়াত এর মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র কোরানে বলেন - হে আহলে বাইত! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। [সূরা আহযাব-৩৩] এই আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,"হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ তো তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদেরকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ রাখিতে চান।" এই আয়াতটি মহানবী (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয় উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর ঘরে। তখন মহানবী (সঃ) ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন কে নিজের আলখাল্লা বা আবা'র মধ্যে নিলেন, এমতাবস্থায় আলী তাঁহার পেছনে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদেরকে একটি চাঁদর দ্বারা আবৃত করিয়া এরূপ দোয়া করিলেনঃ "হে আমার রব! এরাই আমার আহলে বাইত। অপবিত্রতাকে এদের হইতে দূর করিয়া এদেরকে পবিত্র কর।" উম্মে সালমা বলিলেন: "হে আল্লাহর নবী! আমিও কি তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত (আমিও কি উক্ত আয়াতে বর্ণিত আহলে বাইতের সদস্য)? তিনি বলিলেনঃ "(না) তুমি নিজের স্থানেই থাকো। তবে তুমি সত্য ও কল্যাণের পথেই রইয়াছো।" (মুসলিম) এছাড়াও মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরানে রাসুল সাঃ ও ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে আহলে বায়াতের অবস্থান ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে আয়াতে মুবাহেলাতে বলেন 'বলুন : (হে নবী) এসো আমরা আমাদের সন্তানদের আর তোমরাও তোমাদের সন্তানদের এবং আমরা আমাদের নারীদের তোমরা তোমাদের নারীদের এবং আমরা আমাদের নিজেদেরকে (নাফসকে) আর তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ডেকে নিয়ে এসো। অতঃপর আমরা (আল্লাহর দরবারে) আবেদন জানাই এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষণ করি।' (আলে ইমরান : ৬১) উপরোক্ত আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল তখন মহানবী (সা.) হযরত আলী কে তার নিজের নাফস বা প্রতিনিধি রুপে হযরত ফাতিমাকে নারীদের প্রতিনিধিরূপে, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন কে সন্তান হিসাবে উপস্থাপন করে বললেন : 'হে আল্লাহ এরাই আমার আহলে বাইত'। (মুসলিম) আহলে বায়াত কে ভালবাসার জন্য মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্ নির্দেশনা দিয়ে বলেন 'হে হাবীব, আপনি বলে দিন যে, আমি (রাসূল) তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাইনা তবে (আমার) নিকটাত্মীয়দের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা ব্যতীত। [সূরা শুরা-২৩], পবিত্র কোরানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিসে আছে কোন বান্দা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে নিজের জীবন থেকে, আমার বংশধরকে তার বংশধর থেকে, আমার পরিবার-পরিজনকে তার পরিবার-পরিজন থেকে এবং আমার সত্তাকে তার সত্তার চাইতে বেশি ভালোবাসবে না। (তাবরানী) এ প্রসঙ্গে রাসুল আরো বলেছেন, তোমাদের কাছে আমার আহলে বাইত-এর উদাহরণ নূহের নৌকার সমতুল্য। যারা এ নৌকায় আরোহণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে এবং যারা আহলে বাইত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তারা ডুবে যাবে, অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। (তিরমিজী) হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাক (অনুসরণ কর) তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না।" আর যদি একটিকে ছাড় তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তার প্রথমটি হচ্ছে "আল্লাহর কিতাব (কোরআন) দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার ইতরাত, আহলে বাইত" [আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন] এ দু'টি কখনই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সাথে মিলিত হবে। তাদের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ কর, এটা আমি দেখবো। (মুসলিম) এছাড়াও আহলে বায়াতের সম্মানিত সদস্যদের সম্পর্কে পবিত্র কোরানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বতন্ত্র সহিহ হাদিসে আছে "হে আলী! মূসা (আঃ) এর কাছে হারূণ (আঃ) এর যেরূপ মর্যাদা, আমার কাছে তোমারও সেরূপ মর্যাদা। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে আমার পরে কোন নবী নেই।" (বুখারী) 'আর আমরা তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তাঁর ভাই হারূনকে তার উজির (মন্ত্রী / খলীফা / প্রতিনিধি / সাহায্যকারী) নিযুক্ত করেছিলাম (সূরা ফোরকান ৩৫) "আমি যাহার মাওলা (অভিভাবক), আলীও তাহার মাওলা (অভিভাবক) । হে আল্লাহ! যে আলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে তুমিও তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখ, যে আলীর সাথে শত্রুতা রাখে তুমিও তাহার সঙ্গে শত্রুতা রাখ।" (মুসলিম) আলী আমার থেকে এবং আমি তাঁহার থেকে এবং আলীই আমার পর সমস্ত মুমিনগণের ওলি তথা অভিভাববক ও নেতা।" (তিরমিজি) "যে আলীকে দোষারোপ করল, সে আমাকে দোষারোপ করল, আর যে আমাকে দোষারোপ করল সে খোদাকে দোষারোপ করল। আল্লাহ্ তাকে মুখ নীচু করে দোজখে নিক্ষেপ করবেন।" (বুখারী- দ্বিতীয় খন্ড, মুসলিম- দ্বিতীয় খন্ড, তিরমিজি, ৫ম খন্ড)। আলী সব সময়ই হকের পথে থাকবে। "আলী -কে মহব্বত করা ঈমান, আর আলী'র সঙ্গে শত্রুতা করা মুনাফেকী" (মুসলিম,) "আমি জ্ঞানের শহর, আলী তার দরজা।" (তিরমিজি, ৫ম খন্ড) নিশ্চয়ই ফাতেমা আমার প্রাণের টুকরা, তাহাকে যে কষ্ট দিল, সে মূলত আমাকেই কষ্ট দিল"। (মুসলিম)। তিনি আরো বলেন যে "ফাতেমা জান্নাতী নারীগণের নেত্রী।"(বুখারী)।হাসান ও হুসাইন হল জান্নাতের যুবকদের সরদার। (তিরমিজি)

আহলে বায়াত এর মর্যাদা সম্পর্কিত পবিত্র কোরান এর বানী ও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস দ্বারা আমরা মহান আল্লাহ্র দয়ায় এইটুকু বুঝি যে উম্মতে মহাম্মদীর মর্যাদা নির্ধারণ হবে মুলত পবিত্র কোরান অনুসরণ করা তথা তাকওয়া (আল্লাহ্প্রেম ও আল্লাহভীতি) অর্জন এবং এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মহান আল্লাহ্ ও তার রাসুলের নির্দেশ অনুসরন করে রাসুলের প্রতি ও তার আহলে বায়াতের প্রতি আনুগত্য এবং আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসার উপর এবং এই বিধান সমভাবে রাসুলের সাহাবীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পবিত্র কোরান ও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস অনুযায়ী রাসুলের সাহাবীদের মধ্যে যাদের এই বিষয়ে পদস্খলন হয়েছে তারা নিঃসন্দেহে এইক্ষেত্রে বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট হয়েছেন এবং তারা অবশ্যই তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রবর্তী ও প্রথম স্তরের সাহাবীগনদের অন্তর্ভুক্ত নন। আবার ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাহাবী বিশেষ করে যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে ঈমান এনেছেন এবং অর্থ-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছেন তথা অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের এই পদস্খলন জনিত কারনে বিভিন্ন সত্য, অর্ধসত্য ও মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে তাদের ঢালাও ভাবে মুনাফিক বা মুরতাদ মনে করা বা বলা পবিত্র কোরান ও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক একটি ধারনা যা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য বা অনুমোদন যোগ্য নয়।

উম্মতে মহাম্মদির মহা দুর্ভাগ্য এই যে আহলে বায়াতের সম্মানিত সদস্যদের কেহই অবিভক্ত মুসলিম উম্মাহর খলীফা হন নাই এবং সেই সাথে রাসুলের বংশের সম্মানিত ইমামগন ও নন। কারণ মুসলিম উম্মাহ যেকোনো কারণেই হউক তাদের মত মহান, শ্রেষ্ঠ বা উপযুক্ত শাসকের শাসনের উপযুক্ততা বা যোগ্যতা হারিয়েছিল যার কারণে মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের উপযুক্ততা বা যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত শাসকের অধীন করেছিলেন বা করেছেন। এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন ‘এটা এজন্যে যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তাতে পরিবর্তন আনবেন; এবং নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরাঃ আল্-আনফাল, আয়াতঃ ৫৩] "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক নেই।" [সূরাঃ আর-রাদ, আয়াতঃ ১১] রাসুলের অবর্তমানে উম্মতে মুহাম্মদিকে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের একমাত্র বৈধ, উপযুক্ত ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আহলে বায়াতের সম্মানিত সদস্য হজরত আলীকে সম্ভবত তার অল্প বয়স বা অন্য কোন কারনে পরিকল্পিত ভাবে বাদ দিয়ে প্রথম তিন খলিফা হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমান খিলাফত লাভ করেন। তারা ছিলেন ইসলামের একেবারেই প্রাথমিক যুগের সাহাবী এবং ইসলামের জন্য উনাদের অনেক অবদান ও ত্যাগ রয়েছে। তবে তাদের খলিফা থাকাকালিন কিছু সংখ্যক কোরান ও রাসুলের সুন্নাহ বিরোধী কাজসমুহ কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য বা অনুমোদন যোগ্য বা অনুকরণীয় নয় অন্যথায় তা হবে সুনিশ্চিত ভাবে বিভ্রান্তি। আবার তাদের তাদের এই পদস্খলন বা কোরান ও রাসুলের সুন্নাহ বিরোধী কাজ সত্তেও তাদেরকে মুনাফিক (প্রতারক, ভণ্ড, কপট) বা মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) বলা সুনিশ্চিত ভাবে বিভ্রান্তি। কারন এই বিষয় আল্লাহ তাদের মাফ করবেন কী না তার এক্তিয়ার একমাত্র আল্লাহ্র আর আল্লাহ্ সীমা লঙঘন কারীদের কখনোই পছন্দ করেন না।

আমরা জানি রাসুলের আবির্ভাবের সময় মক্কা বা মদিনায় গোত্রীয় শাসন পদ্ধতি চালু ছিল। রাসুল মদিনায় হিজরতের পর সেখানে প্রথম রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করেন ও পরে তা সম্প্রসারিত হয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও অনেকের মধ্যে গোত্র প্রীতি বা স্বজন প্রীতি ভাল মাত্রায়ই বিদ্যমান ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। তদুপরি অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের নেতৃত্ব মানতে তাদের অনীহার প্রমান আমরা পাই সিরিয়া অভিযানে রাসুলের নির্বাচিত সেনাপতি ওসামা বিন জায়েদের নেতৃত্ব মানতে প্রাথমিক অস্বীকৃতি থেকে। রাসুল সঃ ও হজরত আলী ছিলেন হাশেমী বংশের যারা মর্যাদার দিক থেকে অধিক সম্মানিত ছিল হাজীদের পানি পান করানো ও মেহমানদারীর দায়িত্বে থাকার কারনে এবং একই কারনে অন্য গোত্রের অনেক লোক তাদের ঈর্ষা করত। মুহাম্মদ সঃ কে নবী হিসাবে স্বীকার করে তার উপর ঈমান আনলেও গোত্রীয় ঈর্ষা সহ তাকওয়া, জ্ঞান, বীরত্ব, বিনয়, বাগ্মিতা, সহজাত নেতৃত্ব, রাসুলের সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র, রাসুলের প্রিয় কন্যা ও শ্রেষ্ঠ নারী জান্নাতের নেত্রী ফাতেমার স্বামী, জান্নাতের সরদার হাসান ও হোসেনের পিতা, মুমিনদের মওলা, আহলে বায়াতের সম্মানিত সদস্য হওয়া ইত্যাদি সকল কিছুতে মহান আল্লাহ্র বিশেষ ইচ্ছায় ও দয়ায় অতি অল্প বয়সে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় আলীর প্রতি অনেকেই ঈর্ষান্বিত ছিল। তদুপরি বদর, ওহদ, খন্দক প্রমুখ যুদ্ধে কাফের দের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বা খাতিমান ব্যক্তি বা বীর তার হাতে নিহত হওয়ার কারনে তাদের অনেক আত্মীয় স্বজন আলীকে অপছন্দ করত যদিও তারা সবাই মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহন করে। তবে আলীকে পছন্দ করত বা তার অনুসারী ছিল এমন লোকের সংখ্যাও কম ছিল না।

এমতাবস্থায় বিদায় হজের পর পরই রাসুলের কাছের সাহাবীরা যখন বুঝতে পারেন রাসুল তার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন এবং মহান আল্লাহ্র সান্নিদ্ধে তার চলে যাওয়া আসন্ন তখন খুব সম্ভবত (একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত সত্য জানেন) নেতৃত্ব স্থানীয় সাহাবী হজরত ওমর তার মানবীয় বুদ্ধি বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেন যে আলী রাসুলের অবর্তমানে খলিফা হলে অনেকেই তাকে মানতে অস্বীকার করবে এবং এতে ইসলামের ক্ষতি হবে অথবা তিনি নিজেই রাসুলের অবর্তমানে আলীর মত অল্প বয়সী কারও খিলাফত বা নেতৃত্ব মানতে রাজি ছিলেন না। উল্লেখ্য রাসুলের অফাতের সময় হজরত আবুবকরের বয়স ছিল ৫৯ বছর, হজরত ওমরের বয়স ছিল ৪৯ বছর, হজরত ওসমানের বয়স ছিল ৫৬ বছর এবং হজরত আলীর বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর। অতঃপর তিনি তার নিজের অপেক্ষা বয়স্ক, জ্ঞানী, গ্রহণযোগ্য ও রাসুলের কাছের নেতৃত্ব স্থানীয় সাহাবী হজরত আবুবকর কে রাসুলের অবর্তমানে খলিফা নির্বাচন করবেন বলে পরিকল্পনা করেন এবং এই পরিকল্পনায় হজরত আবুবকর সহ কয়েকজনকে পর্যায়ক্রমে যুক্ত করেন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তিনি রাসুলের ওফাতের সময় রাসুল কে তার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করে ওসিয়ত করতে বাধা দেন যা সহিহ হাদিসে পাওয়া যায় 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে রেওয়ায়েত হয়েছে যে তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী (সাঃ)'র ওফাত যখন নিকটবর্তী হয়ে এল তখন হুজরার মধ্যে অনেক সাহাবি উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে হযরত উমর ইবনে খাত্তাবও ছিলেন। তিনি (সাঃ) বললেন (লেখনীর সামগ্রী) আনো। আমি তোমাদের জন্য একটি লেখা লিখে দেই। আমার পরবর্তীকালে তোমরা কখনো গোমরা হবে না। হযরত উমর বললেন যে, নবী (সাঃ) এর কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তোমাদের কাছে কোরআন আছে, আর আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। গৃহবাসীদের মধ্যে (তাঁদের মধ্যে যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন) বিরোধ হয়ে গেল। আর তাঁরা ঝগড়া করতে লাগলেন। কেউ বলতে লাগলেন। (লেখার সরঞ্জাম) নিয়ে আস যাতে রাসূল (সাঃ) তোমাদের জন্য এমন কিছু লেখা লিখে যান যার পর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর কেউ কেউ সেই কথা বলতে লাগলেন যা হযরত উমর বলেছিলেন। নবী (সাঃ) এর সম্মুখে শোরগোল ও বিরোধ যখন চরম আকার ধারণা করলো তখন তিনি (সাঃ) বললেন, 'আমার কাছ থেকে উঠে যাও।' (বুখারি,) অতঃপর রাসুলের ওফাত হলে তিনি তরবারি নিয়ে বের হলেন আর বললেন: 'যে বলবে হজরত মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, আমি তাকে খুন করব।' অতঃপর হজরত আবুবকর এসে বললেন হে লোক সকল! তোমাদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মাদ এর ইবাদত করত তাদের যেনে রাখা উচিত যে মুহাম্মাদ মৃত্যু বরণ করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর ইবাদত করত তাদের যেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী। আল্লাহ বলেনঃ মুহাম্মাদ তো আল্লাহর রাসূল, তার পূর্বে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। যদি তিনি ইন্তেকাল করেন বা নিহত হন তোমরা কি তোমাদের পশ্চাদে ফিরে যাবে? বস্তুত যে ব্যক্তি তার পশ্চাদে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদেরকে প্রতিদান দিবেন। (আলে ইমরানঃ ১৪৪) ইবনুল মুসাইয়িব বলেনঃ ওমর বলেন, আমি যখন আবূ বকর (রা) কে উক্ত আয়াতটি পাঠ করতে শুনলাম তখনই আমি অবস হয়ে গেলাম। আমার দুই পা আমাকে বহন করতে পারলনা। তার কাছে উক্ত আয়াত শুনে যমীনে পড়ে গেলাম এবং এক্বীন করে নিলাম যে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যু বরণ করেছেন।' পরিকল্পনা করে রাসুল কে ওসিয়ত করতে না দেয়া বা রাসুলের ইন্তেকালের কথা বললে হত্যা করার কথা বলা নিঃসন্দেহে কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী কাজ এবং হজরত আবুবকর এর এই নাটকীয় বক্তব্যও সম্ভবত (একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত সত্য জানেন) পরিকল্পনার অংশ বলে প্রতীয়মান হয় কারন সাহাবীদের মধ্যে কারা মুহাম্মদের ইবাদত করত তা আমরা কোথাও কখনও খুজে পাই নাই।

অতঃপর রাসুলের দেহ মোবারক দাফনের পূর্বেই আনসাররা তাদের মধ্য থেকে রাসুলের অবর্তমানে খলিফা নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে (যারা ওমরের এই পরিকল্পনার অংশ ছিলেন না) যেহেতু রাসুল কে ওসিয়ত করতে দেয়া হয় নাই বা তিনি ওসিয়ত করেন নাই। অতঃপর সেখানে হজরত আবুবকর, হজরত ওমর প্রমুখ সহ এই পরিকল্পনার সাথে যুক্ত বেক্তিরা সহ অনেকেই উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ এবং উত্তপ্ত আলোচনা শেষে উপস্থিত সকলে মিলে হজরত আবুবকর কে খলিফা নির্বাচিত করেন। উল্লেখ্য এই প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রধান ভুমিকা রাখেন হজরত ওমর যিনি উগ্র মেজাজের কারনে জনপ্রিয় ছিলেন না কিন্তু স্পষ্টভাষিতার জন্য তার কথার গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। তদপরি হজরত আবুবকর ইসলামের ৩য় ঈমান আনা বেক্তি যিনি হজরত খাদিজা রাঃ ও মওলা আলীর পর ঈমান এনেছেন। যিনি রাসুলের কাছাকাছি বয়সের বন্ধুস্থানিয় মর্যাদা সম্পন্ন ও নেতৃত্ব স্থানীয় বেক্তি ছিলেন। যখন মক্কার কাফেররা রাসুল সঃ কে হত্যার পরিকল্পনা করে তখন তিনি মদিনায় হিজরতের সময় হজরত আবুবকর কে সঙ্গী করেন অন্যদিকে তার কাছে থাকা সকল আমানত হজরত আলীকে বুঝিয়ে দেন হকদারদের ঠিকমত বুঝিয়ে দেবার জন্য । এই দুই সাহাবীর দুই দায়িত্বই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ও মর্যাদার। তবে রাসুলের অবর্তমানে তার বিছানায় শুয়ে তাকে হত্যা করতে আশা কাফেরদের জন্য অপেক্ষা করা ও রাসুলের কাছে গচ্ছিত আমানত তার অবর্তমানে পৌঁছে দেয়া অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান কারন রাসুলের সঃ কাফেরদের কাছে ধরা পরার মধ্যে অনিশ্চয়তা ছিল কিন্তু ঘরে থাকা আলীর কাফেরদের সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিত ছিল। যাই হউক এই খলিফা নির্বাচনের পুরা প্রক্রিয়ায় হজরত আলী অনুপস্থিত ছিলেন কারন স্বভাবতই রাসুলের সর্বাপেক্ষা কাছের বা পরিবারের লোক বা আহলে বায়াতের সদস্য হিসাবে

তিনি অধিক শোকাহত ছিলেন এবং রাসুলের গোসল, দাফন ও জানাজার প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন। এই প্রক্রিয়া শেষে শোক কাটিয়ে হজরত আলী যখন জানতে পারেন যে রাসুলের দাফনের পূর্বেই হজরত আবুবকর খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন এবং মদিনার অধিকাংশ আনসার ও মুজাহির ইতিমধ্যে তার হাতে বায়াত গ্রহন করেছে অতঃপর তিনি খিলাফতের ব্যাপারে রাসুলের অবর্তমানে আহলে বায়াতের সদস্য হিসাবে একমাত্র তারই বৈধতা বা ন্যায্যতা বা যোগ্যতা বা শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে লোকদেরকে তার কাছে বায়াত গ্রহন করতে আহবান জানান কিন্তু তিনি মোটেই আশানুরূপ সাড়া পান নাই নানাবিধ কারনে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি যারা ইতোমধ্যে হজরত আবুবকর এর কাছে বায়াত বা আনুগত্য করেছেন তাদের অধিকাংশ সেই শপথ ভাঙতে রাজি ছিলেন না। অতঃপর তিনি হজরত আবুবকর এর কাছে বায়াত নিতে প্রথমে আপত্তি করেন কারন রাসুলের অবর্তমানে তার সাহাবীদের এই পদস্খলন এর কারনে অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান বা রাসুলের নির্দেশিত আহলে বায়াতের মর্যাদা অনুযায়ী হজরত আলীকে খিলাফত থেকে বাদ দিয়ে হজরত আবুবকর খলিফা নির্বাচিত হওয়ায় হজরত ফাতেমা রাঃ ও খুব কষ্ট পান। অতঃপর হজরত ফাতেমা রাঃ এর ইন্তিকালের পর তিনি হজরত আবুবকর এর নিকট বায়াত গ্রহন করেন। হজরত আবুবকর তার মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে তার খিলাফত প্রাপ্তির মুল কারিগর হজরত ওমরকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ খলিফা নিযুক্ত করেন। যে অসিয়ত রাসুল কে পরিকল্পনা করে করতে দেয়া হয় নাই অসুস্ততার অজুহাতে এবং হজরত আবুবকর কে কেউ বলেনাই তোমাদের কাছে কোরআন আছে, আর আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট এবং হজরত ওমর ও তার মৃত্যুকালে ওসিয়ত করলেন খলিফা নিযুক্তের ব্যাপারে। নিজের মানবীয় বুদ্ধি ও বিবেচনাপ্রসূত ও পরিকল্পিত যেই খিলাফত পরিচালনার ধারা হজরত আবুবকর ও তিনি চালু করছিলেন যাতে ইতোমধ্যেই কিছু কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী বিধান ও বিদআত চালু হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা রক্ষার অসিয়ত। যাতে কোরান ও রাসুলের সুন্নাহ অনুসরণের পাশাপাশি পূর্ববর্তী দুই খলিফার সুন্নাহ অনুসরণের শর্ত সামনে আসলে হজরত আলী স্বভাবতই তাদের কোন বেদআত বা কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী বিধান অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং হজরত ওসমান সেই শর্তে রাজি হলে তিনি খলিফা নিযুক্ত হউন। এই সময় হজরত ওসমান এর বয়স ছিল প্রায় ৭০ বছর। হজরত আবুবকর এর নিকট বায়াত গ্রহন করার পর যথাক্রমে হজরত ওমর ও হজরত হজরত ওসমান এর নিকট বায়াত গ্রহন করার ব্যাপারে হজরত আলী আর কোন আপত্তি করেন নাই।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে মওলা আলী আল্লাহ্র নির্দেশ ও রাসুলের আদর্শ **(আমার প্রভু আমাকে নয়টি নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলো হলো : গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে, সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে ন্যায় কথা বলতে, দারিদ্র ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থাতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে,যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক জুড়তে,যে আমাকে বঞ্চিত করে, তাকে দান করতে, যে আমার প্রতি অবিচার করে, তাকে ক্ষমা করে দিতে, আমার নীরবতা যেন চিন্তা গবেষণায় কাটে, আমার কথাবার্তা যেনো হয় উপদেশমূলক,আমার প্রতিটি দৃষ্টি যেনো হয় শিক্ষা গ্রহণকারী। এ ছাড়া ও আমার প্রভু আমাকে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো হলো :আমি যেনো ভালো কাজের আদেশ করি এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করি।)** অনুসরণ করে ধৈর্য ধারন করেন। প্রথম তিন খলিফার প্রত্যেকের সাথে তার চমৎকার সৌহার্দপূর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং প্রথম তিন খলিফা যখনই সাহায্যের জন্য বা পরামর্শের জন্য তার শরণাপন্ন হয়েছেন তখনই তিনি তার সমাধান দিয়েছেন। তিনি প্রথম তিন খলিফা সহ সকলের প্রতি ভালো কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা কখনও তাকে অনুসরণ করেছেন আবার কখনও করেন নাই। হজরত ওসমান বিদ্রোহী দ্বারা গৃহবন্দি থাকাকালীন তার নিরাপত্তার জন্য নিজের পুত্রদের তথা আহলে বায়াতের সম্মানিত সদস্য ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন কে খোলা তলোয়ার হাতে দরজায় পাহারায় নিযুক্ত করেন। তবে বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্যের কারনে বা বাড়ির দেয়াল টপকিয়ে ভিতরে প্রবেশের কারনে হজরত ওসমান শাহাদাত বরন করেন। তার মৃত্যুর পর জনগন মসজিদে নববী তে হজরত আলীকে খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি প্রথমে তা নিতে অস্বীকার করেন কারন প্রথম তিন খলিফার আমলে বিশেষ করে হজরত ওসমানের শেষ দিকে ইতিমধ্যে জনগন কোরান ও সুন্নাহ থেকে বেশ কিছুটা দুরেই সরে গিয়েছিল। বিশেষ করে সম্পদের বণ্টনের বা মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য দেখা দিয়েছিল এবং একাধিকবার দুর্ভিক্ষও হয়েছিল যার অন্যতম কারন ছিল ইসলামের মুল শিক্ষা সম্পদের সমবণ্টন অনুসরণ না করা। এছাড়া হজরত ওমরের তালাক সংক্রান্ত কোরান এর মুল শিক্ষার এবং রাসুলের সুন্নাহের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক, একসাথে তিন তালাক দিলে তা এক তালাকের পরিবর্তে তিন তালাক হিসাবে কার্যকর হওয়া সহ কিছু বেদাত চালু হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে তালাক সংক্রান্ত বিভ্রান্তি সামাজিক ভাবে সর্বাপেক্ষা বিধ্বংসী যা আজও মুসলিম সমাজ বহন করছে এই বিভ্রান্ত বেদআতকে অনুসরণ করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে একসাথে রাগের মাথায় যতবার তালাক বলাই হোক না কেন তা এক তালাক বলেই গণ্য হবে কোরান ও সুন্নাহ অনুযায়ী। এছাড়াও আহলে বায়াতের মর্যাদা সম্পর্কে অধিকাংশ লোক অবগত ছিল না কারন ইসলামি সাম্রাজ্য অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল আর অধিকাংশ লোক ছিল নও মুসলিম এবং খিলফতের বাইরে থাকার দরুন

আহলে বায়াতের সম্মানিত সদস্য গন স্বভাবতই প্রথম তিন খলিফার তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পরেছিল যা অবশ্য এখন পর্যন্ত অধিকাংশ উম্মতে মহাম্মদির মধ্যে বজায় আছে। আর আহলে বায়াতের সম্মানিত সদস্য হজরত আলীর প্রকৃত মর্যাদা তার সকল সমর্থকরাও যে উপলব্ধি করতে পারে নাই তার প্রমান আমরা পাই যুদ্ধের ময়দান সহ অনেক ক্ষেত্রে তার নির্দেশ অমান্য করা ধেকে। অন্যান্য প্রথম শ্রেণির সাহাবী যেমন তালহা, জুবাইর প্রমুখকে খিলাফতের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করা হলেও তারা বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানালে মউলা আলী জনগনের চাপে একপ্রকার বাধ্য হয়ে খিলাফতের দায়িত্ব নেন যা আল্লাহ্র বিধান বা রাসুলের নির্দেশিত আহলে বায়াতের মর্যাদা অনুযায়ী তার নেওয়ার কথা ছিল রাসুলের ওফাতের পর। তিনি পবিত্র কোরান তথা আল্লাহ্র নির্দেশ ও রাসুলের সুন্নাহ পরিপূর্ণ অনুসরণ করে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তিনি মোটেও শান্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন নাই কারন মুসলিম উম্মাহ বা ইসলামি সাম্রাজ্য ইতিমধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

মানুষ হিসাবে ব্যক্তিগত স্বভাব চরিত্রের বা দ্বীনের দিক প্রথম তিন খলিফা ছিলেন উন্নত স্তরের মুমিন এবং অধিকাংশও মানুষ অপেক্ষা উত্তম। আর খলিফা হিসাবে ওমর ছিলেন ওসমান অপেক্ষা অধিক দক্ষ এবং আবুবকর ছিলেন ওমর অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। হজরত ওসমান কে তার বয়সের কারনেই হউক বা তার অসৎ আত্মীয় স্বজনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারনেই হউক খলিফা বা শাসক হিসাবে দক্ষ বলা ন্যায়সঙ্গত হবে না। তবে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর নিঃসন্দেহে ইতিহাসের অধিকাংশ খলীফা বা শাসক অপেক্ষা উত্তম ছিলেন কারন পৃথিবীর অধিকাংশ শাসকই দ্বীনের বা ধর্মের বা স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে নমরুদ, ফেরাউন, মুয়াবিয়া, এজিদ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বা হিটলার মানের। হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজের মানের খলীফা বা শাসক পৃথিবী খুব বেশী দেখে নাই। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর তাদের মানবীয় দোষত্রুটি বা বুদ্ধি ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন ন্যায়পরায়নতার সাথে ও স্বজন প্রীতি বা গোত্র প্রীতির উর্ধে জনগনের কল্যাণে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে। এক্ষেত্রে তাদের অবদান বা সফলতা বা দক্ষতা অস্বীকার করা কখনই ন্যায় সঙ্গত হবে না আবার সেই সাথে তাদের আহলে বায়াত বা আলী কে পরিকল্পিত ভাবে খিলাফত থেকে বাদ দেয়া সহ অন্যান্য কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী বিধান ও বিদআত চালু জনিত পদস্খলন অস্বীকার করাও ন্যায় সঙ্গত হবে না। আল্লাহ্ ও রাসুলের বিধান অনুসরণ না করে অর্থাৎ আহলে বায়াতকে বা আলীকে বাদ দিয়ে মানবীয় বুদ্ধি ও বিবেচনাপ্রসূত ও পরিকল্পিত যেই খিলাফত পরিচালনার ধারা হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর চালু করেছিলেন তার সাময়িক ফলাফল অর্থাৎ তাদের খিলাফতের আমল তুলনামুলক ভাবে কম ক্ষতিকারক ছিল তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারনে। যে যোগ্যতার উপর তাদের অগাধ আস্থা ছিল এবং সেই সীমাহীন আস্থার কারনে তারা রাসুলকে ওসিয়ত করতে দেন নাই বা আল্লাহ্র বিধান লঙঘন করেছিলেন, যার ফলাফল নিকট ভবিষ্যতে হল ভয়াবহ। কারন তাদের এই ভ্রান্ত নীতির ফলশ্রুতিতে বা ধারাবাহিক পরিক্রমায় ইতিহাসে মুয়াবিয়া বা এজিদ ও খারেজি প্রমুখের উত্থান হয়। আহলে বায়াতের সম্মানিত সদস্য হজরত আলী, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন ও নবীর বংশের অধিকাংশ পুরুষ সদস্যদের উম্মতে মহাম্মদি নামধারিদের দ্বারা শহীদ হতে হয় বিভ্রান্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদ অনুসারিদের দ্বারা বা অবৈধ ও অযোগ্য খিলাফত দাবিদারদের দ্বারা গুপ্ত হত্যা বা বিষ প্রয়োগ বা কারবালার বিয়োগাত্মক ঘটনার মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে ব্যাপক ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা নৈতিক বিভ্রান্তির সুচনা হয়। নিঃসন্দেহে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমান প্রমুখ মহান আল্লাহ্র কাছে, তার রাসুলের এবং তার রাসুলের আহলে বায়াতের সম্মানিত সদস্যদের কাছে তথা বেহেশতের মালিক ও নেতা নেত্রিদের কাছে তাদের এই মানবীয় ভুলের জন্য ও তার ফলাফলের কারনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছেন। ‘অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (নেসা- ৯৯) তবে প্রথম তিন খলিফা হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমান প্রমুখ এর পদস্খলনের সাথে উমাইয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের পদস্খলনের কোন তুলনা হয় না। কারন তিনি ছিলেন হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বাহ্যিক ভাবে ঈমান আনা ব্যক্তি তদুপরি নেতৃত্ব এর যোগ্যতা বা প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পন্ন হলেও দ্বীনের বা ধর্মের বা স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে তিনি ছিলেন মুনাফিক। কারন সহিহ হাদিস ‘চারটি স্বভাব এমন যার সবগুলো কারো মধ্যে থাকলে সে পুরোদস্তর মুনাফিক, আর যার মধ্যে তার কোনো একটি থাকবে, সে যতক্ষণ তা পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাবই থাকবে। স্বভাব চারটি হচ্ছে- যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় সে তাতে খিয়ানত করে, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন কোনো ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন কারো সাথে ঝগড়া করে গালাগালি করে’ (বুখারি ও মুসলিম) অনুযায়ী তাহার মধ্যে এই চারটি স্বভাবই বিদ্যমান ছিল বলে আমরা প্রমান পাই। তিনি ছিলেন প্রতারক ও মিথ্যাবাদী কারন তিনি হজরত ওসমান এর রক্ত মাখা জামা দেখিয়ে আহলে বায়াতের সম্মানিত সদস্য হজরত আলীর বিরুদ্ধে লোকজনকে উস্কানি দিয়েছিলেন মিথ্যা ও প্রতারনার মাধ্যমে, তিনি সিফফিনের যুদ্ধে কাপুরুষতা, মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে, এছাড়া তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে ঈমাম হাসানের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে তার নিকৃষ্ট ও পাপিষ্ঠ পুত্র এজিদকে খলীফা নির্বাচন করে একই সাথে আমানতের

খেয়ানতকারি ও ওয়াদা ভঙ্গকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আর তিনি জুমার নামাজের পর হজরত আলী ও তার বংশ তথা রাসুলের বংশ বা আহলে বায়াতের উপর গালি দেওয়ার প্রথা চালু করে পুরদস্তর মুনাফিক রূপে নিজেকে প্রমানিত করেন। আলী সব সময়ই হকের পথে থাকবে। "আলী -কে মহব্বত করা ঈমান, আর আলী'র সঙ্গে শত্রুতা করা মুনাফেকী" (মুসলিম,) সত্যত্যাগী একদল বিদ্রোহী আম্মারকে হত্যা করবে । আম্মার তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহবান করবে তারা আম্মারকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে । তার হত্যাকারী এবং যারা তার অস্ত্র ও পরিচ্ছেদ খুলে ফেলবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী । (বুখারী, তিরমিজি) উল্লেখ্য হজরত আম্মার বিন ইয়াসির সিফফিনের যুদ্ধে হজরত আলীর পক্ষে জিহাদে মুয়াবিয়ার সৈন্য দ্বারা শহীদ হউন। তদুপরি মুয়াবিয়া ছিলেন অন্যায় যুদ্ধকারী, অন্যায় হত্যাকারী, আর আলির সাথে শত্রুতা ত রাসুলের সাথে তথা আল্লাহ্বর সাথেই শত্রুতা। মহান আল্লাহ্বর কি বিধান ! নিকৃষ্ট মুনাফিক, ফাসেক, মুয়াবিয়া বা তদপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট তার পুত্র এজিদ ছিলেন ইব্রাহিম আঃ বা তার পুত্র ইসমাইল আঃ এর বংশধর কিন্তু জালিমদের অন্তরভুক্ত। আহলে বায়াতের সাথে তথা রাসুলের সাথে বা আল্লাহ্বর সাথে শত্রুতাকারী মুয়াবিয়া বা তার পুত্র এজিদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সাথে বা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক জাল হাদিস যা অসৎ রাজনৈতিক বা অন্য উদ্দেশে বানান এবং অজ্ঞতা বা অন্য অসৎ উদ্দেশে সংরক্ষিত তার উপর ভিত্তি করে যিনি বা যারা বলবেন বা বিশ্বাস করবেন মুয়াবিয়া বা এজিদ উন্নত তাকওয়ার ব্যক্তি ছিলেন বা তাদের জন্য বেহেশত অবধারিত তবে তিনি বা তারা যেই যুগের যত বড় অলি বা আলেম নামধারী হন না কেন এই বিষয়ে সন্দেহাতীত ভাবে বিভ্রান্ত।

রাসুলের সাহাবী বা সমসাময়িক যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রবর্তী ও প্রথম স্তরের ব্যক্তি যারা মুত্তাকি (আল্লাহ্প্রেমী ও আল্লাহভীতিসম্পন্ন) অথবা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) স্তরের ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয় তাদের মধ্যে হজরত সালমান ফারসি (যাকে রাসুল নিজের পরিবারভুক্ত বলেছেন), হজরত আবু জর গিফারি, হজরত আম্মার বিন ইয়াসির, হযরত ওয়াইস করনি (যিনি বাহ্যিক ভাবে রাসুলের সহবত পান নাই) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের অনেকের এইরূপ ভ্রান্ত ধারনা আছে যে রাসুলের সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ কোন সাহাবী বা সাহাবীদের তাকওয়া বা মর্যাদা রাসুলের আহলে বায়াত এর যেকোন সদস্য অপেক্ষা অধিক ছিল। এটি পবিত্র কোরান ও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক একটি ধারনা। পবিত্র কোরআনের সাথে বা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক জাল হাদিস যা অসৎ রাজনৈতিক বা অন্য উদ্দেশে বানান এবং অজ্ঞতা বা অন্য অসৎ উদ্দেশে সংরক্ষিত তার উপর ভিত্তি করে যিনি বা যারা বলবেন বা বিশ্বাস করবেন যে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে আহলে বায়াত এর যেকোন সদস্য অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তি বা সাহাবীর তাকওয়া বা মর্যাদা অধিক তবে তিনি বা তারা যেই যুগের যত বড় অলি বা আলেম নামধারী বেক্তিই হন না কেন এই বিষয়ে সন্দেহাতীত ভাবে বিভ্রান্ত।

হাদিস সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ এই কাজটি গবেষণা ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে সন্দেহাতীত ভাবে একটি অতি জটিল ও কষ্টসাধ্য কাজ ছিল এবং এই কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন যুগের সম্মানিত বেক্তিদের অবদান কে অস্বীকার করা কখনই ন্যায়সঙ্গত হবে না। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে হাদিস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেকেই হাদিসের সত্যতা বা শুদ্ধতা যাচাইয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড পবিত্র কোরানের সাথে সামঞ্জস্যতা এড়িয়ে গেছেন। এমন বহু সংখ্যক বানোয়াট বা জাল হাদিস সংরক্ষিত হয়েছে যা পবিত্র কোরানের সাথে বা এর মুল ভাবার্থের সাথে অথবা পবিত্র কোরানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। অনেক জাল বা বানোয়াট হাদিসে আমরা আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সঃ বা তার আহলে বায়াতের সম্পর্কে অনেক মর্যাদাহানিকর এবং রাসুলের বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মিথ্যাচার ও দেখতে পাই। বস্তুত রাসুলের অবর্তমানে আহলে বায়াত ও রাসুলের বংশের ইমামদের শ্রেষ্ঠত্ব বা খিলাফতের একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকার এই সত্যকে কে অস্বীকার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা, উমাইয়া ও আব্বসিয়া সহ সকল অবৈধ ও অযোগ্য খলিফাদের খিলাফত কে বৈধতা দেয়া ও তাদের বহুমাত্রিক চারিত্রিক স্খলনকে স্বাভাবিক প্রমান করে শাসক শ্রেণীকে তুষ্ট করা, এই ধরনের বিভ্রান্ত ও অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশে অথবা পবিত্র কোরানের মুল শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারনে জাল হাদিস বানান, বা সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাদিসের সত্যতা ও শুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হল পবিত্র কোরান বা এর মুল ভাবার্থের সাথে সামঞ্জস্যতা এবং পবিত্র কোরানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস এর সাথে সামঞ্জস্যতা । এই দুইয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হলে যেকোনো হাদিস তা যার নামেই বর্ণিত হউক বা যার দ্বারাই সংরক্ষিত হউক না কেন সন্দেহাতীত ভাবে জাল বা বাতিল বলে গণ্য হবে। তাই হাদিসের সত্যতা বা শুদ্ধতা বুঝতে আমাদের অধিক পরিমানে কোরান পাঠ ও গবেষণা করতে হবে ও তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং সেইসাথে মহান আল্লাহ্বর কাছে দয়া ভিক্ষা চাইতে

হবে তিনি যেন আমাদের সংশোধন ও পবিত্র করে ফুরকান তথা সত্য- মিথ্যার প্রভেদ জ্ঞান তথা ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দান করেন।

আল্লাহ্ বলেন হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার উলুল আমর দের (নায়েবে রাসুল) অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।(আন-নিসা ৫৯) প্রিয়নবী মুহাম্মদ সঃ এর পর আহলে বায়াত ,তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রবর্তী ও প্রথম স্তরের সাহাবীগন, রাসুলের বংশের ইমামগনের অবর্তমানে নায়েবে রাসুল বা রাসুলের উত্তরসুরি কারা এই বিষয়ে সঠিক ভাবে বুঝতে হলে আমাদের পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিস অনুসরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী মুহাম্মদ সঃ বলেন "যে (আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে] ইলম তথা জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন।ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার পায়ের নিচে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। একজন ইলম অন্বেষণ কারীর জন্য আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবাই ক্ষমা প্রার্থনা ও দুয়া করে; এমনকি পানির মধ্যকার মাছও। আর একজন আলেমের মর্যাদা একজন সাধারণ আবেদ (ইবাদতকারী) এর তুলনায় পূর্ণিমা রাতে সমস্ত নক্ষত্ররাজির তুলনায় চাঁদের মত। **আলেমগণ নবীদের উত্তরসূরী**। নবীগণ উত্তরাধিকারী সম্পদ হিসেবে দিনার-দিরহাম তথা অর্থ-সম্পদ রেখে যান না বরং তারা উত্তরাধিকারী সম্পদ হিসেবে রেখে গেছেন ইলম। যে সেটাকে গ্রহণ করল সে যেন পুর্ণ অংশকেই গ্রহণ করল।" (তিরমীজি-) এই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরান ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখি যে মহান আল্লাহ্ তার অলি (বন্ধু) বা তিনি যাদেরকে আলেম (জ্ঞানী) বলেছেন মুলত সমার্থক রুপে ব্যাবহার করেছেন অর্থাৎ একটি অপরটির পরিপুরক। কারন প্রেম (আল্লাহ্ প্রেম ও ভীতি বা তাকওয়া) ও জ্ঞান বেতিত আল্লাহ্র অলি বা বন্ধু হওয়া অসম্ভব অন্যদিকে আল্লাহ্র দয়া বেতিত বা অলি (বন্ধু) হওয়া বেতিত প্রকৃত বা সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব না। আর এই সঠিক জ্ঞান এর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদ্রাসার শিক্ষা, আরবি ভাষী হওয়া বা কোরআনের হাফেয বা শাইখুল হাদিস হওয়ার সাথে সরাসরি কোন সম্পর্ক নাই। অনেক সঠিক আল্লাহ্র অলি বা আলেমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন আবার অনেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। পবিত্র কোরান এর সঠিক জ্ঞান এর জন্য যা অত্যাবশ্যক তা হল আল্লাহ্র বিশেষ দয়া তথা দ্বীন বা স্বভাব চরিত্রের শুদ্ধতা বা আত্মার পবিত্রতা অর্জন বা তাকওয়া অর্জন, কোরান পাঠ ও গবেষণা এবং সঠিক আলেম বা আল্লাহ্র অলির তথা মুর্শিদের সান্নিধ্য। এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন 'বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন যা সংরক্ষিত আছে লাউহে মাহ্ফূযে' ('আল-বুরুজ ২১-২২) নিশ্চয় এটা মহিমান্বিত কুরআন। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। **পূত-পবিত্রগণ** ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না। এটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। (আল-ওয়াকিয়া ৭৭-৮০) নিশ্চয় এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি ওটা পাঠ করি,তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর অতঃপর নিশ্চয় এর বিবৃতির দায়িত্ব আমারই। (আল-ক্বিয়ামাহ ১৭-১৯) যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা অর্জন করতে পারে না। (আল-বাকারা ২৫৫) মহান আল্লাহ্ দয়া করা যাদের এই জ্ঞান দান করেন তারাই হল তার অলি (বন্ধু) বা আলেম (জ্ঞানী) যাদের সম্পর্কে তিনি বলেন 'জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধু অলি-আউলিয়াদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাযুক্তও হন না। যাঁরা বিশ্বাস করেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাঁদের জন্য ইহকাল ও পরকালের জীবনে সুসংবাদ আছে, আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটিই মহা সাফল্য। (সূরা ইউনুস, আয়াত, ৬২-৬৪) আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতারা এবং ন্যায়নিষ্ঠ আলেমরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮) " তোমরা যদি না জানো তবে আলেমদের জিজ্ঞাসা করো।" [সূরা নাহল : ৪৩] 'বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে?' (সূরা জুমার, আয়াত : ৯) ' "আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? "যাকে প্রজ্ঞা (গভীর জ্ঞান) দান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।" [সূরা বাকারা :২৬৯] "নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম তারাই তাঁকে অধিক ভয় করে।" [সূরা ফাতির : ২৮] 'নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (আর তারা বলে) পরওয়ারদেগার এসব তুমি বিনা কারণে সৃষ্টি করোনি। সব পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।' (সূরা আল ইমরান: ১৯০-১৯১) যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে; তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জানো না। (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৫৪) যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে; তাদেরকে মৃত মনে করো না, তারা বরং জীবিত, নিজের রবের পক্ষ থেকে রিযিকও প্রাপ্ত। (সূরা, আল ইমরান আয়াত : ১৬৯)। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত। আর যাকে ভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য পথনির্দেশকারী কোন অভিভাবক (অলিয়্যাম্মুর্শিদা) পাবে না। (সূরা আল-কাহফ আয়াত ১৭) অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও

অলীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত হাদীসে বলেনঃ "মহান আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমার বান্দার উপর যা আমি ফরয করেছি তা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোন প্রিয় বস্তু নেই যার মাধ্যমে সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে। আমার বান্দা আমার কাছে নফল কাজ সমূহ দ্বারা নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালবাসি। তারপর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে শুনে, তার দৃষ্টি শক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধারণ করে আর তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলে। তখন আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা অবশ্যই দেব, আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে অবশ্যই উদ্ধার করব"। [বুখারী; ৬৫০২] পবিত্র কোরানের এই আয়াত সমুহ ও উল্লেখিত সহিহ হাদিস থেকে আমরা এই ধারনা পাই যে সঠিক আওলিয়া বা আলেমরা হল নায়েবে রাসুল যারা নবি বা রাসুলদের অবর্তমান হেদায়েতি কাজ করবেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে। বিপথগামী মানুষ কে সঠিক পথ দেখাবেন যাতে মানুষ আল্লাহ্র পথে বা তার রাসুলের সঠিক শিক্ষা অনুসরন করে তাকওয়া অর্জন করে বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে চলে তার নৈকট্য লাভ করে। আর যারা কোরান ও সহিহ হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ্র অলিদের বা আলেমদের যে মর্যাদা আল্লাহ্ স্বয়ং দিয়েছেন তা অস্বীকার করে তারা যেই যুগের যত বড় নামধারী ধর্ম প্রচারক হউক না কেন এই বিষয়ে সুনিশ্চিত ভাবেই বিভ্রান্ত।

নায়েবে রাসুল বা সহিহ আওলিয়া বা আলেম গন নবীদের অবর্তমানে পবিত্র কোরানে বর্ণিত রাসুলের যে দায়িত্ব সমুহ পালন করেন তার মধ্যে রয়েছে 'হে আমাদের রব ! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন; তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। (আল-বাকারা ১২৯) আর অপর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকাজের সাথে অন্য অসৎকাজ মিশিয়ে ফেলেছে: আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদের সম্পদ থেকে সদাকাহ গ্রহণ করবে যাতে তা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পার। তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে, বস্তুতঃ তোমার দু'আ তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক, আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন সব কিছু জানেন। তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের (অনুশোচনাপূর্ণ) ক্ষমাপ্রার্থনা কবুল করে থাকেন আর সদাকাহ গ্রহণ করেন। আর আল্লাহই তো তাওবাহ কবূলকারী, অতি দয়ালু। আর বল, 'তোমরা আমল কর। অতএব, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা তোমরা আমল করতে সে সম্পর্কে'।আর কতক আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষায় থাকল, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদের তাওবাহ কবূল করবেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, বড়ই প্রজ্ঞাময়। (সূরাঃআত-তাওবা ১০২ - ১০৬) এছাড়াও আত্মসমর্পণকারী স্তরের নায়েবে রাসুল বা সহিহ আওলিয়া বা আলেম গন অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন অন্য মুত্তাকি স্তরের বেক্তিদের মধ্যে উপযুক্ত বেক্তির মহান আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা যেই প্রক্রিয়ায় সাধারণত তারা নিজেরাও আত্মসমর্পণকারী স্তরে পৌঁছেছেন। নবীদের ক্ষেত্রে যেমন হজরত ইব্রাহিম আঃ বা নবী মুহাম্মদ সঃ সহ অনেক নবীদের মহান আল্লাহ্ সরাসরি এই স্তরে নিয়ে গেছেন। তবে উম্মতে মুহাম্মদির ক্ষেত্রে এই মাধ্যম আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়। তবে এক্ষেত্রে সরাসরি বাহ্যিক সহবত আবশ্যিক নাও হতে পারে যার প্রমান আমরা পাই হযরত ওয়াইস করনির ক্ষেত্রে যিনি রাসুলের সরাসরি / বাহ্যিক সহবত পান নাই। অনেক সময় নায়েবে রাসুল বা সহিহ আওলিয়া বা আলেম গনের অজ্ঞাতসারে তাদেরই মাধ্যমে উপযুক্ত মুত্তাকি স্তরের বেক্তি আত্মসমর্পণকারী স্তরে পৌঁছে যান। বস্তুত হেদায়েত বা আল্লাহ্র এই সর্বোচ্চ দয়ার এখতিয়ার বা মালিক একান্তই এবং একমাত্র স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন।

এই প্রক্রিয়ায় মুত্তাকি স্তরের বেক্তি আত্মিক ভাবে মহান আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভ করে তার নিকট আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশে আল্লাহ্র প্রতিনিধি নায়েবে রাসুলের কাছে নিজের আমিত্বকে সমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি তার যোগ্যতা থাকলে সংশ্লিষ্ট নায়েবে রাসুলের মাধ্যমেই আত্মিক ভাবে রাসুলের সঃ সান্নিধ্য পান ও তার নিকট নিজের আমিত্বকে সমর্পণ করেন এবং একই প্রক্রিয়ায় তিনি আত্মিক ভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এর সাক্ষাত লাভ করেন ও তার প্রতি নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে তার হয়ে যান এবং আল্লাহ্ তাকে বিশেষ ভালবাসেন বা সর্বোচ্চ দয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন । সুফিবাদের ভাষায় একে বলে ফানা ফিস শায়খ (মুর্শিদে বিলীন বা সমর্পিত হওয়া) ফানা ফির রাসুল (রাসুলে বিলীন বা সমর্পিত হওয়া) ফানা ফিল্লাহ- (আল্লাহ্তে বিলীন বা সমর্পিত হওয়া) বাকা বিল্লাহ (আল্লাহ্র হয়ে যাওয়া বা তার সাক্ষাত লাভ করা বা তার নৈকট্য অর্জন করা) বলে। মহান আল্লাহ্ তার সাক্ষাত সম্পর্কে বলেন 'হে মানুষ! তুমি তোমার রবের কাছে পৌছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে হবে, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে। (সুরা ইনশিকাক, আয়াত ৬) যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।} [সূরা: আল-আনকাবুত :৫] তোমাদের ইলাহ একমাত্র

সত্য ইলাহ।কাজেই যে তার রব-এর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রব-এর ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে। [সূরা: আল-কাহাফ, আয়াত:১১০। যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকে এবং এতেই যারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে উদাসীন এই লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (সুরা ইউনুস, আয়াত ৭ -৮) আর আল্লাহ্র সাক্ষাতের মাধ্যম হিসাবে তার সাথে সাক্ষাতকারী বা নৈকট্য লাভকারী আত্মসমর্পণকারী স্তরের নবী বা রাসুল বা তার নায়েবে রাসুল তথা আওলিয়া বা আলেম গনের দায়িত্ব বা মর্যাদা নিশ্চিত করে অলীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত হাদীস ছাড়াও পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণকে অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ ও রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি' এবং তারা এর মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করতে চায়। তারাই প্রকৃত কাফির। আর আমরা প্রস্তুত রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা নিসা ১৫০-১৫১)

অনেকে এই ভ্রান্ত ধারনা রাখেন যে আল্লাহ্র বিভিন্ন নবী, রাসুল, আহলে বায়াত, তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রবর্তী সাহাবিগন, ইমামগন, অলি বা আলেম গন ব্যাপক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বা হন ও প্রায়ই নানাবিধ অলৌকিক কার্যক্রম করে থাকেন এবং এই ক্ষমতাই তাদের প্রধান যোগ্যতা বা মর্যাদা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র এই বিশেষ প্রতিনিধিদের বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। মহান আল্লাহ্ তাদের মুল যে কাজ অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে হেদায়েতি কাজ করবেন, এরই সহায়ক হিসাবে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী বা প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে থাকেন এবং তারা তা আল্লাহ্র নির্দেশে বা অনুমতিক্রমে বা অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় হলে ব্যবহার করে থাকেন। তবে এটি কখনই তাদের আবশ্যিক বা প্রধান যোগ্যতা বা মর্যাদা নয়। আল্লাহ্র বিভিন্ন নবী, রাসুল, আহলে বায়াত, তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রবর্তী সাহাবিগন, ইমামগন, অলি বা আলেম গন দের প্রধান যোগ্যতা বা মর্যাদা হল তারা মহান আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত, সর্বোচ্চ দয়ার অন্তর্ভুক্ত, আত্মসমর্পণকারী স্তরের বান্দা যাদের আল্লাহ্ বিশেষ ভালবাসেন এবং তাদের তিনি সর্বাপেক্ষা মর্যাদার দায়িত্ব (হেদায়েতি কাজ করা বা হেদায়েতের অসিলা হওয়া বা মুত্তাকি স্তরের বেক্তির আত্মসমর্পণকারী হওয়ার অসিলা হওয়া) অর্পণ করেন। তবে হেদায়েতের বা আল্লাহ্র এই সর্বোচ্চ দয়ার এখতিয়ার বা মালিক একান্তই এবং একমাত্র স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল যারা নিজেদের তরিকতপন্থী বা পীরপন্থি বা সুফিবাদের অনুসারি বলে দাবি করে তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ সহিহ আওলিয়াদের বা আলেমদের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে না ভেবে বা না বুঝে, তাদের আসল শিক্ষা অনুসরণ না করে শুধু পার্থিব দুনিয়ার লাভের জন্য (যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে; তাদেরকে মৃত মনে করো না, তারা বরং জীবিত, নিজের রবের পক্ষ থেকে রিযিকও প্রাপ্ত। সূরা, আল ইমরান আয়াত : ১৬৯) তাদেরকে বাহ্যিক ভাবে মান্য করে। সেই সাথে এইরুপ ভয়াবহ ভ্রান্ত ধারনা রাখে যে আমরা যতই আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করি না, যত পাপ করিনা কেন অথবা ধর্মের বা স্বভাব চরিত্রের বা দ্বীনের দিক থেকে যে স্তরের হই না কেন আমাদের পীর বা মুর্শিদ আমাদের জন্য সুপারিশ করে আমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ যাদের সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন বা দিবেন বা গ্রহন করবেন তারা আল্লাহ্র রাসুলের সঠিক উম্মাত বা অনুসরণকারী বেতিত অর্থাৎ দ্বীনের বা স্বভাব চরিত্রের বা ধর্মের দিক থেকে যারা কাফের, মুশরিক বা মুনাফিক স্তরের জালিম বা ফাসেক তাদের কারও জন্য সুপারিশ করবেন না। এ মর্মে আল্লাহ্ কোরানে বলেন "দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। **কিন্তু ওরা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না**।সকল মুখমন্ডলই সেই চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক (আল্লাহর) জন্য অবনমিত হবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে যুলুমের ভার বহন করবে। আর যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে তার কোন অবিচার ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চনার আশঙ্কা নেই। আর এভাবেই আমরা কুরআনকে নাযিল করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা এটা তাদের জন্য উপদেশ হয়। সুতরাং প্রকৃত মালিক আল্লাহ অতি মহান, সর্বোচ্চ স্বত্বা। (সূরা ত্বো-হাঃ ১০৯-১১৪) তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না এবং তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। আর **তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যই যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট** এবং তারা তার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। আর তাদের মধ্যে যে বলবে, তিনি ব্যতীত আমিই ইলাহ, তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তির প্রতিদান দেব; এভাবেই আমরা যালেমদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা আম্বীয়াঃ ২৭ -২৯)

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু। মানুষ যে যা চায় তাকে তিনি তার যোগ্যতা ও সাধনা অনুযায়ী তাই দান করেন। আমরা যদি পার্থিব দুনিয়া চাই তাহলে তিনি তার বিধান অনুসারে তাই দিবেন কখনো হয়ত তার আওলিয়াদের বা আলেমদের অসিলায় বা দোয়ায় অথবা অন্য কোন অসিলায়। তবে পবিত্র কোরান অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া বিভিন্ন দেব দেবীর বা তাগুত বা সমাজ বা শয়তান বা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য তথা অর্থ বা টাকার উপাসনা করা, প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা, নফসের খেয়াল-খুশী বা নিজ প্রবৃত্তির উপাসনা করা, রিয়া বা লোক দেখান আমল (কাজ) বা ইবাদত (আনুগত্য, গোলামি) তথা লোকের প্রশংসার তথা মানুষের উপাসনা করা, ইত্যাদি ছোট বা বড় শিরক' এর অন্তর্ভুক্ত। আর যে সকল ভণ্ড ও প্রতারক আওলিয়া বা আলেম নামধারী ব্যক্তি সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন তারা এবং তাদের বিভ্রান্ত অনুসারিরা যদি তওবা করে সংশোধন না হন তবে তারা তাদের বিভ্রান্ত অনুসারিসহ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর যে সকল ধর্ম প্রচারকগন বিভিন্ন বিষয়ে বিভ্রান্তি নিয়েও ধর্ম প্রচারের মত মর্যাদাপূর্ণ কাজ করছেন তারা তাদের ঈমান, আকিদা ও আমল যাচাই বা সংশোধন করে পরিশুদ্ধ হয়ে বা উপযুক্ততা অর্জন করে সঠিক ধর্ম বা ইসলাম বা ইসলামের শিক্ষা প্রচার না করলে তারাও বিভ্রান্ত অনুসারিসহ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।এই মর্মে আল্লাহ্ পবিত্র কোরানে বলেন 'ফলে কিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং তাদেরও পাপভার যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট। (ছুরা নাহল আয়াত ২৫) আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের আগে যে জিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা আগুনে প্রবেশ কর। যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অন্য দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। অবশেষে যখন সবাই তাতে একত্র হবে তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন। আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না। (সুরা আরাফ আয়াত ৩৮) তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, সুতরাং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং মহা অভিসম্পাত কর।' [সুরা আহযাব আয়াত ৬৭-৬৮) সুতরাং আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।। (ছুরা ছাফফাত আয়াত ৩২) যাদের জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের রব! এরা তো তারা যাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম; আমরা এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা তাদের ব্যাপারে দায়মুক্ততা ঘোষণা করছি। এরা তো আমাদের ইবাদাত করত না। (সুরা ক্বাছাছ আয়াত ৬৩)

এইরূপ ভয়াবহ ভীতিকর অবস্থার মধ্যে আমাদের সকলের মানুষ হিসাবে (ইসলাম ধর্মের অনুসারি দাবিদার সহ) প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল আত্ম পরিচয় অনুসন্ধান করা তথা আমাদের দ্বীনে বা ধর্মে বা স্বভাব চরিত্রের মধ্যে কতটুকু কুফরি (অবিশ্বাস বা অস্বীকার), মুশরিকি (অংশীবাদীতা) বা মুনাফেকি (কপটতা) আছে তা উপলব্ধি করা এবং আল্লাহ্র কাছে দয়া ভিক্ষা চেয়ে, ক্ষমা প্রার্থনা করে, তওবা করে, জিহাদে আকবর বা কঠিন প্রচেষ্টা বা কঠিন সাধনার মাধ্যমে, ধৈর্যশীল হয়ে, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি প্রার্থনার মাধ্যমে নিজের দ্বীন বা ধর্ম বা স্বভাব সংশোধন করে মুমিনদের (বিশ্বাসীদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে অতঃপর মুত্তাকীদের (আল্লাহ্প্রেমী ও আল্লাহভীতিসম্পন্ন দের) বা মুসলমানদের (আত্মসমর্পণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাতে করে আমরা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি থেকে তথা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাই। আমরা আল্লাহ্র কাছে দয়া ভিক্ষা চাই 'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ই যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু। বিচার দিনের একমাত্র অধিপতি। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের সরল পথ দেখাও। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (সুরা ফাতেহা)

প্রধান আকিদা বা বিশ্বাসের বিষয় সমুহঃ

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ই যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু। বিচার দিনের একমাত্র অধিপতি। মহান স্রষ্টা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে মওলা আলী যা বলেছেন এর চেয়ে সুন্দর বা পরিপূর্ণ ভাবে মহা পবিত্র সর্বশক্তিমান এর পরিচিতি প্রকাশ করা সম্ভব না বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তা আবার উল্লেখ করা হল।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য যার গুণরাজী কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করে শেষ করতে পারে না। তাঁর নেয়ামতসমূহ গণনাকারীরা গুনে শেষ করতে পারে না। প্রচেষ্টাকারীগণ তাঁর নেয়ামতের হক আদায় করতে পারে না। আমাদের সমুদয় প্রচেষ্টা ও জ্ঞান দ্বারা তার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা সম্ভব না এবং আমাদের সমগ্র বোধশক্তি দ্বারা তার মাহাত্ম্য অনুভব করা সম্ভব না। তার গুণ বর্ণনার কোন পরিসীমা নির্ধারিত নেই এবং তা কোন লেখা বা বক্তব্য, কোন সময় বা স্থিতিকাল দ্বারা নির্দিষ্ট করা সম্ভব না। তিনি নিজ কুদরতে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন, আপন করুনায় বাতাসকে প্রবাহিত করেছেন এবং শিলাময় পাহাড় দ্বারা কম্পমান পৃথিবীকে সুদৃঢ় করেছেন।

আল্লাহর মারেফতই তথা তার পরিচয় লাভ করা তথা তাকে জেনে বুঝে তার নৈকট্য লাভ করাই হল দ্বীনের ভিত্তি। এ মা'রেফাতের পরিপূর্ণতা আসে তাঁকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ায়; সাক্ষ্যের পরিপূর্ণতা হয় তাঁর একত্বের বিশ্বাসে; বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা হয় তার মহা পবিত্র সত্তাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তথা তার সাক্ষাত লাভের জন্য আমল করায়; আমলের পূর্ণতা অর্জিত হয় তাঁর প্রতি সত্তা বহির্ভূত কোন বৈশিষ্ট্য আরোপ না করায়। কারণ কোন কিছুতে বৈশিষ্ট্য আরোপিত হলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আরোপিত বিষয় থেকে তা পৃথক এবং যার ওপর বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয় সে নিজে সেই বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক। যে কেউ আল্লাহতে সত্তা বহির্ভূত কোন সিফাত বা গুন বা বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সে তাঁকে ঐ গুন বা বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতির আপেক্ষিক সদৃশতার স্বীকৃতি দেয়; যে তাঁর আপেক্ষিক সদৃশতা স্বীকার করে সে তার দ্বৈতের স্বীকৃতি দেয়; যে তাঁর দ্বৈতের স্বীকৃতি দেয় সে তাঁকে খন্ডভাবে দেখে; যে তাকে খন্ডভাবে দেখে সে তাঁকে ভুল বুঝে; যে তাঁকে ভুল বুঝে সে তাকে চিনতে অক্ষম; যে তাকে চিনতে অক্ষম সে তার ত্রুটি স্বীকার করে; সে তার ত্রুটি স্বীকার করে; সে তাঁকে সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ করে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে তিনি কি, সে জেনে রাখুক, তিনি সব কিছু ধারন করে আছেন; এবং যদি কেউ প্রশ্ন করে তিনি কিসের ওপর আছেন, সে জেনে নিক , তিনি নির্দিষ্ট কোন কিছুর উপর নেই। যদি কেউ তার অবস্থিতি নির্দিষ্ট কোন স্থানে মনে করে তবে সে কিছু কিছু স্থানকে আল্লাহ বিহীন মনে করল । তিনি ওই সত্তা যাঁর আগমন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে নি। তিনি অস্তিত্বশীল, কিন্তু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসেন নি। তিনি সব কিছুতেই আছেন, কিন্তু কোন প্রকার ভৌত নৈকট্য দ্বারা নয়। তিনি সব কিছু থেকে ভিন্ন, কিন্তু বস্তুগত দ্বান্দ্বিকতা ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে নয়। তিনি কর্ম সম্পাদন করেন কিন্তু সঞ্চলন ও হাতিয়ারের মাধ্যমে নয়। । তিনিই একমাত্র একক সত্ত্বা, যিনি তখনও দেখতেন যখন দেখার মতো কিছু সৃষ্টি হয় নি, যখন এমন কিছুই ছিল না, যার সাথে তিনি সঙ্গ রাখতেন অথবা যার অনুপস্থিতি অনুভব করতেন।

কেয়ামতের বা শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসঃ পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে কেয়ামত সম্পর্কে আমরা যা বুঝি তা হল কেয়ামত মূলত দুই প্রকার। ১। মহাপ্রলয়, ২। বেক্তির প্রলয় বা মৃত্যু। মহা প্রলয় নিয়ে আল্লাহ্ বলেন -"যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যখন তারাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে, যখন সমুদ্র উথলে উঠবে, যখন কবরগুলো উন্মোচিত করা হবে, তখন প্রত্যেকে জানবে সে আগে কি পাঠিয়েছিল আর পিছনে কি রেখে এসেছে" (সূরা- ইনফিতার, আয়াত- ১-৫)। "সাত আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তা সেদিন নিস্তেজ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, আর ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় কিনারায় থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের প্রতিপালকের আরশকে নিজেদের উপর ধারণ করবে; সেদিন তোমাদেকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না" (সূরা- হাক্কাহ, আয়াত- ১৬-১৮) আর তিনি বেক্তির প্রলয় বা মৃত্যু বা কেয়ামত নিয়ে বলেন "জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে । যাকে অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়" (সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ১৮৫) "কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়" (সূরা- মরিয়ম, আয়াত- ৯৫) ।"তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না । আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন" (সূরা- মুমতাহিনা, আয়াত- ৩) । -"কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের মানদণ্ড । সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করব, হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট" (সূরা- আম্বিয়া, আয়াত- ৪৭) । হে মানুষ! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহে থাকো তবে নিশ্চয়ই জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাকা থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট গোশত থেকে। তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার নিমিত্তে। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থিত রাখি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু দেওয়া হয় এ বয়সেই, আবার কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় হীনতম বয়সে, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরও কিছু না জানে। তুমি জমিনকে দেখতে পাও

শুষ্কাবস্থায়, অতঃপর যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান;-সূরা হজ: ৫-৬) পবিত্র কোরান ও কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিস অনুযায়ী প্রত্যেক আদম সন্তানকে তার কেয়ামতের দিন অর্থাৎ তার মৃত্যুর সাথে সাথে তাকে তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ১.**তোমার প্রতিপালক কে?** ২.**তোমার দ্বীন বা ধর্ম বা স্বভাব চরিত্র কী ছিল** ৩. **মহানবী স. কে দেখিয়ে বলা হবে এ ব্যক্তিটি কে**?

এখন যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রভু বা ইলাহা বা উপাস্য হিসাবে আল্লাহ্ বেতিত অন্য কিছুকে বা কাউকে গ্রহন করেছেন বা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করেছেন তথা শির্ক বা অংশীদার, কুফর বা অস্বীকার, নিফাক বা কপটতার এর মধ্যে ডুবে ছিলেন তাহলে তিনি প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই আমানত খেয়ানত কারি এবং ওয়াদা ভঙ্গকারী প্রমানিত হবেন কারন দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই আমরা সবাই আল্লাহ্র কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম যে তিনিই আমাদের রব বা প্রভু এবং তিনি আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন । আর ২য় প্রশ্নের উত্তরে যারা দ্বীনের বা ধর্মের বা স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে কাফের (অস্বীকারকারী বা অবিশ্বাসী), মুশরিক (অংশীবাদী), মুনাফিক (প্রতারক, ভণ্ড, কপট) তারা নিজেদেরকে ইসলাম বা আত্মসমর্পণ ধর্মের অনুসারী বা মুমিন (বিশ্বাসী) বা মুত্তাকি (আল্লাহ্প্রেমী ও আল্লাহভীতিসম্পন্ন) বা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) দাবি করতে পারবেনা। আর ৩য় প্রশ্নের উত্তরে যারা আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে তার রাসুলের অনুসরণ করেছেন তারা বেতিত যারা জালিম বা ফাসেকদের অনুরসন বা অনুকরন করেছেন তারা এইখানেও সফল হবেন না অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবেন। মৃত্যু পরবর্তী এই প্রশ্ন বা প্রত্যেক মানুষের দুনিয়াতে করা সকল আমলের বা কাজের তথা তার মৃত্যুর পূর্বের সর্বশেষ **দ্বীন বা ধর্ম বা স্বভাব চরিত্রের** মূল্যায়ন এবং তার ফলাফল অনুসারে পরবর্তী গন্তব্য বা অবস্থান বা শাস্তি বা পুরস্কার সকল মানব আত্মার জন্য একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয় অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া থেকে কোন বেক্তিকে অব্যাহতি দেয়া হবে অথবা বিনা হিসাবে বেহেশতে নেয়া হবে এমন কথা আল্লাহ্ কোরআনের কোথাও বলেন নাই। অতএব এইরূপ ধারনা যদি কারও থেকে থাকে তবে তা পবিত্র কোরআনের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক একটি ধারনা ।

প্রত্যেক মানুষের দুনিয়াতে করা সকল আমলের বা কাজের তথা তার মৃত্যুর পূর্বের সর্বশেষ **দ্বীন বা ধর্ম বা স্বভাব চরিত্র** এর মূল্যায়ন এবং তার ফলাফল অনুসারে পরবর্তী গন্তব্য বা অবস্থান বা শাস্তি বা পুরস্কার নিয়ে মহান আল্লাহ্ বেহেস্তের পুরস্কারের ও জাহান্নামের আগুনের শাস্তির পাশাপাশি আকৃতি পরিবর্তনের কথা ও বলেছেন। 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম আকার আকৃতি দিয়ে, তারপর আমরা তাকে পরিণত করি হীনদের মধ্যে হীনতমে কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (ত্বীন : ৪-৬) "আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই তোমাদের আকার আকৃতি পরিবর্তন করতে আর তোমাদেরকে (নতুনভাবে) এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জান না। আর অবশ্যই তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করা না কেন? (সূরাঃ আল-ওয়াকিয়া ৬০-৬২) এবং আমি ইচ্ছা করলে এদের স্ব-স্ব স্থানে এদের আকৃতি বিকৃত করে দিতে পারতাম, ফলে এরা আগে বাড়তে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না। (সূরাঃ ইয়াসীন ৬৭) তোমরা সৎকর্ম করলে সৎকর্ম নিজেদেরই জন্য করবে, আর মন্দকর্ম করলে তাও নিজেদের জন্য; অতঃপর পরবর্তী প্রতিশ্রুত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার দাসদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করবার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেই ভাবেই তাতে প্রবেশ করবার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবার জন্য। সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমরাও পুনরাবৃত্তি করব। আর জাহান্নামকে আমরা করেছি কাফিরদের জন্য কারাগার। [সুরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৭-৮] তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙঘণ করেছিল। আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। [সুরা বাকারা ২:৬৫] :বল, আমি তোমাদেরকে কি এর চেয়ে খারাপ কিছুর সংবাদ দেব যা আল্লাহর নিকট প্রতিদান হিসেবে আছে? (আর তা হল) যাকে আল্লাহ লা'নাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে তিনি বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন আর যারা তাগুতের 'ইবাদাত করেছে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানের লোক এবং সরল সত্য পথ হতে সবচেয়ে বিচ্যুত। (সূরাঃ আল-মায়েদা ৬০) কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। [সুরা বাকারা ২:২৮] প্রকৃত পক্ষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাকে শাস্তি দিবেন বা কাকে পুরস্কৃত করবেন বা কাকে সুযোগ দিবেন এই বিষয়ে এক্তিয়ার একমাত্র ও একান্তই তার আর তিনি অবশ্যই পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু, ক্ষমাশীল ও সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক।

ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাসঃ ফেরেশতা আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি। তারা আল্লাহর অতি সম্মানিত ও পুণ্যবান সৃষ্টি। তারা সবসময় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন। পানাহার, বৈবাহিক ও জৈবিক চাহিদা থেকে তারা পুরোপুরি মুক্ত থাকেন। তারা পুরুষও নন, নারীও নন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন 'সকল প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর, যিনি ফেরেশতাদের বার্তাবাহক করেন, যারা দুই দুই, তিন তিন বা চার চার পক্ষবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সুরা ফাতির, আয়াত : ০১) হজরত আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন জিকিরটি উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহ যা তাঁর ফেরেশতা ও বান্দাদের জন্য নির্বাচন করেছেন—সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি। অর্থ : আল্লাহ পূতপবিত্র এবং সব প্রশংসা শুধু তাঁর জন্যই। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৯১৬) ফেরেশতা সম্পর্কে মউলা আলী বলেনঃ অতঃপর মহান স্রষ্টা বিভিন্ন আকাশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট স্থান বিন্যাস করলেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ফেরেশতা দ্বারা নির্ধারিত স্থানসমুহ পরিপূর্ণ করলেন। তাদের মধ্যে কেহ-কেহ সেজদাবনত যারা কখনো রুকু করে না, কেহ-কেহ রুকু অবস্থায় যারা কখনো দাঁড়ায় না এবং কেহ-কেহ সুবিন্যস্তভাবে অবস্থান করছেন যারা কখনো তাদের স্থান পরিত্যাগ করেন না। অন্যরা সর্বক্ষণ আল্লাহ্র তসবীহ পাঠ করেন এবং তারা ক্লান্ত হয় না। নয়নের নিদ্রা, বুদ্ধির বিভ্রান্তি, শরীরের অবসন্নতা অথবা বিস্মৃতির প্রভাব এদের স্পর্শ করে না।

ফেরেশতাদের মধ্যে কেহ-কেহ তার বিশ্বস্ত অহিবাহক যারা নবীদের নিকট আল্লাহ্র মুখপাত্র হিসাবে তার আদেশ নির্দেশকে পৌঁছে দেন। কেহ-কেহ আল্লাহ্র সৃষ্টি রক্ষার কাজে নিযুক্ত। আবার কেহ-কেহ বেহেস্তের দরজার প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত। আরও অনেক আছে যাদের পদদ্বয় ভুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরে স্থিরভাবে স্থাপিত এবং তাদের শিরোদেশ আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে প্রসারিত এবং তাদের বাহু চতুর্দিকে সম্প্রসারিত। তাদের স্কন্ধ আরশের স্তম্ভের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের চোখ আরশের প্রতি নিবদ্ধ এবং তাদের পাখা আরশের নিচে বিস্তৃত। তারা তাদের নিজেদের মধ্যে এবং অন্য সকল কিছুর মধ্যে সম্মানিত পর্দা ও কুদরতের আবরন তৈরি করেছেন। তারা তাদের মহান স্রষ্টাকে আকৃতির মাধ্যমে ধারন করে না তারা স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির কোন গুনারোপ করে না, তাকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করে না এবং উপমার মাধ্যমে তার প্রতি ইঙ্গিত করে না।

কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর বিশ্বাসঃ সকল নবিদের প্রচারিত ধর্ম ছিল ইসলাম (আত্মসমর্পণ)। এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন "তারা বলে- ইহুদী হও অথবা খৃষ্টান হও, তাহলে তোমরা হিদায়াত পাবে। আপনি বলুন! আমরা বরং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের দ্বীন অনুসরণ করব আর ইব্রাহীম মুশরিক ছিলেন না। তোমরা বল! আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আল্লাহ যা আমাদের প্রতি নাযিল করেছেন ও যা নাযিল করেছেন ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদের প্রতি আর মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রভুর নিকট থেকে যা দেয়া হয়েছে তার প্রতিও। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না আর আমরাতো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী বা মুসলিম। কাজেই তারাও যদি তোমাদের মত ঈমান আনে তাহলে তারাও হিদায়াত পাবে। আর যদি তারা ঈমান না এনে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা শত্রুভাবাপন্ন আর তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।" -(সূরা বাকারাহঃ আয়াত ১৩০-১৩৪) মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সৃষ্টির আদি থেকে মানুষের জন্য একটি মাত্র ধর্ম ই আল্লাহ মনোনীত করেছেন তা হল ইসলাম (আত্মসমর্পণ)। বিভিন্ন যুগে আল্লাহ্র বিভিন্ন নবী বা রাসুল বা সতর্ককারীগন বিপথগামী মানুষকে সঠিক পথে তথা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণের পথে আহবান করেছেন। যাদের মাত্র কয়েকজনের নাম আল্লাহ্ কোরআনে উল্লেখ করেছেন। 'আমি তোমাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোনো জাতি নেই, যার মধ্যে সতর্ককারী আসেনি।' (সুরা ফাতির, আয়াত : ২৪),"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক"। সুরা আন-নাহলঃ ৩৬। আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রসূলের কাজ নয়। যখন আল্লাহর আদেশ আসবে, তখন ন্যায় সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সুরা মুমিন, আয়াত : ৭৮) পবিত্র কোরআনের আলোকে আমরা জানি যে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যথাক্রমে হজরত মুসা আঃ ও হজরত ঈসা আঃ এর এবং তাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতের ও ইঞ্জিলের অনুসারি দাবীদার। যদিও কালের পরিক্রমায় ও স্বার্থান্বেষী মহলের হস্তক্ষেপে এই দুই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হয়েছে ও এর অনুসারি দাবীদারবৃন্দ অধিকাংশ বিভ্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া পবিত্র কোরআনের আলোকে আমরা একথাও বলতে পারি সনাতনি হিন্দু, বৌদ্ধ সহ অন্যান্য ধর্মের সম্মানিত প্রচারক বা সংস্কারক বা অবতার বৃন্দ যেমন শ্রীকৃষ্ণ বা গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ এবং তাদের সম্মানিত ধর্মগ্রন্থ বেদ, গীতা, ত্রিপিটক প্রমুখ এর মুল বা অবিকৃত শিক্ষা যদি হয় মহান স্রষ্টার একত্ববাদের এবং তার প্রতি আত্মসমর্পণ বা আমিত্বকে সমর্পণ তথা ইসলামের তবে

নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহ্র নবী, রাসুল বা সতর্ক কারী ছিলেন এবং তাদের সম্মানিত ধর্মগ্রন্থসমুহ ঐশী ধর্মগ্রন্থ যা কালের পরিক্রমায় ও স্বার্থান্বেষী মহলের হস্তক্ষেপে বিকৃত হয়েছে ও এর অনুসারি দাবীদারবৃন্দ অধিকাংশ বিভ্রান্ত হয়েছেন। ইসলাম ধর্মের অনুসারি দাবীদারদের মধ্যেও যেমন অধিকাংশ বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন যদিও কোরআনের মুল গ্রন্থ এখনও অবিকৃত আছে এবং যা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ।

প্রধান প্রার্থনা ও ইবাদত সমুহঃ ইবাদত ও প্রার্থনার মধ্যে সূক্ষ্ম এক ধরনের পার্থক্য আছে তা হল এবাদত হল একটি সামগ্রিক বিষয় অর্থাৎ সকল কাজ, কথায় ও চিন্তায় আল্লাহ্র আনুগত্য করা বা দাসত্ব করা বা নির্দেশনা অনুসরণ করা। আর প্রার্থনা হল সুনির্দিষ্ট আচার বা পদ্ধতি যা মহান আল্লাহ বা তার রাসুল আমাদের অনুসরণ করতে বলেছেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বা তাকওয়া অর্জনের জন্য। তাই সকল প্রার্থনাই এবাদতের অন্তর্ভুক্ত তবে সকল এবাদত প্রার্থনা নাও হতে পারে। যেমন নামাজ, জিকির, রোজা, যাকাত, কোরবানি, হজ, এগুলো প্রার্থনা এবং অবশ্যই ইবাদত। আবার আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে দান করা সহ সকল উত্তম কাজ করা বা তার নির্দেশ অনুসরণ করা এবং তার অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা ইবাদত প্রার্থনা নাও হতে পারে। মহান আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস আনার পর (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল) এর প্রমান স্বরূপ আমাদের দ্বীন বা স্বভাব চরিত্র সংশোধনের জন্য জিহাদে আকবরের অংশ হিসাবে এই প্রার্থনা সমুহ অতি গুরুত্বপূর্ণ। সকল প্রার্থনার মুল উদ্দেশ্য হল তাকওয়া অর্জন করা, আল্লাহ্র ইবাদতের অংশ হিসাবে তাকে স্মরণ করা, তার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া, তার সন্তুষ্টি অর্জন করা ও তার নৈকট্য অর্জন করা।

সালাত বা নামাজঃ সালাত বা নামাজ হল আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত ও রাসুল কর্তৃক প্রদর্শিত মুমিনদের দৈনিক প্রার্থনা বা ইবাদত। এটি বান্দার আত্মার ও শরীরের উপর আল্লাহ্র হক বা অধিকার। আমরা অনেকে নামাজকে শুধু শারীরিক ইবাদত বা প্রার্থনা মনে করলেও পবিত্র কোরান ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখি যে এটি মুলত সামগ্রিক তথা আত্মিক ও শারীরিক ইবাদত বা প্রার্থনা। এই মর্মে আল্লাহ বলেন 'আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। [সুরা ত্বা-হা ২০:১৪] তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং **বিনীতগণ ব্যতীত** আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। (তারাই বিনীত), যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে তাদের **সাক্ষাৎ** ঘটবে এবং তারই দিকে তারা ফিরে যাবে।(সূরা: বাকারাহ, আয়াত ৪৫-৪৬) অতঃপর যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা: নিসা, আয়াত: ১০৩) আপনি তেলাওয়াত করুন কিতাব থেকে যা আপনার প্রতি ওহী করা হয় এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আর **আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ।** তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা: আনকাবুত, আয়াত: ৪৫) তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে **বিনীতভাবে; (**সূরা: বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮) নিশ্চয় মুমিনগণ সফলকাম, যারা নিজেদের নামাযে **অন্তরের বিনয়** প্রকাশ করে। (সূরাঃ মু'মিন আয়াত-১-২) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে **দ্বীনকে** (ধর্ম, প্রকৃতি, স্বভাব চরিত্র) ইসলাম (আত্মসমর্পণ) / বিচারদিবসকে অস্বীকার করে? সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। **অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন** ;যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে এবং ছোটখাট সাহায্য দানে ও বিরত থাকে। (সূরা মাউন) বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎ সমূহের প্রতি পালক আল্লাহর জন্যে। (সূরা: আনয়াম, আয়াত: ১৬২) **যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর**, তাই আপনার সালাতের জন্য দাঁড়ানোর বেশী হকদার। সেখানে এমন লোক আছে যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে, আর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। (সূরা আত তাওবাহ ১০৮) পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়, কিন্তু সৎকর্ম হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ্, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনবে আর সম্পদ দান করবে তাঁর ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে। তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই **মুত্তাকী (আল্লাহ্প্রেমী ও আল্লাহভীতিসম্পন্ন)**। [সুরা বাকারা ২:১৭৭] । রাসুল সঃ বলেন 'মুমিন যখন নামাযে দাড়ায় তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে।' (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৩) তোমাদের কেউ যখন নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে আলাপ করে। সুতরাং তার উচিত সে কিভাবে আলাপ করছে সেদিকে যথাযথভাবে লক্ষ রাখা। -(মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৮৬১) ইহসান হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তো (অবশ্যই)

তোমাকে দেখছেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০। দৈনিক ০৫ ওয়াক্ত সালাত এর সম্পর্কে সহিহ হাদিসের পাশাপাশি আল্লাহ্ কোরআনে বলেন 'আর তারা যা বলে সে সম্পর্কে আপনি ধৈর্যধারণ করুন আর আপনি নামাজ আদায় করুন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে, রাত্রিকালে এবং দিবসের প্রান্ত সমূহে, যাতে করে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। (সূরা ত্বহা: ১৩০) উক্ত আয়াতে সূর্যোদয়ের পূর্বে এই শব্দ দ্বারা ফজরের নামাজ, দিনের প্রান্ত সমুহে এই শব্দ দ্বারা জোহরের নামাজ, সূর্যাস্তের পূর্বে এই শব্দ দ্বারা আসরের নামাজ, রাত্রির মধ্যখানে এই শব্দ দ্বারা মাগরিব ও এশার নামাজ কে বোঝানো হয়েছে। এই ০৫ ওয়াক্ত নামাজে ফজর ০২ রাকাত, যোহর ০৪ রাকাত, আসর ০৪ রাকাত, মাগরিব ০৩ রাকাত, এবং এশা ০৪ রাকাত মোট ১৭ রাকাত ফরজ নামাজ। শুক্রবার কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যোহরের ০৪ রাকআতের পরিবর্তে ০২ রাকাত ফরজ জুমার নামাজ জামাত সহকারে আদায় করতে হয়। এর বাইরে বিভিন্ন প্রকার নফল নামাজ আছে যাদের নানাবিধ মর্যাদা বা ফযিলত আছে। বিশেষ প্রয়োজনে একাধিক ওয়াক্তের সালাত একসাথে আদায় করা যায় তবে তা নিয়মিত করা বা নিয়ম করে ফেলা উত্তম কাজ না বলেই প্রতীয়মান হয়। একই ভাবে শারীরিক সামর্থ্য থাকলে দাড়িয়ে নামাজ পড়তে হয় অন্যথায় বসে বা ইশারায় ও নামাজ পড়া যায়।

বস্তুত সালাত কায়েম অর্থ হল আত্মিক ও শারীরিক ভাবে আল্লাহ্র স্মরণ প্রতিষ্ঠা করা। সালাতে আমরা যা পাঠ করি তা অবশ্যই অর্থ বুঝে পড়া উত্তম। যেহেতু সালাত আত্মিক ও শারীরিক ইবাদত যাতে শারীরিক পবিত্রতার জন্য ওযু বা তায়ামুম করা আবশ্যক ঠিক তেমনি সালাতে একাগ্রতা ও বিনয় আবশ্যক। এই একাগ্রতা বা বিনয় কখনও আত্মিক পবিত্রতা বেতিত সম্ভব না। আর আত্মিক পবিত্রতা মানে হল দ্বীন বা স্বভাব চরিত্রের শুদ্ধতা। অর্থাৎ দ্বীনের দিক থেকে কাফের, মুশরিক বা মুনাফিক স্তরের লোকদের শারীরিক সালাত হলেও আত্মিক ভাবে সালাত বা পরিপূর্ণ সালাত কখনই হয় না। সফল মুমিন বা মুত্তাকি বা মুসলমান স্তরের বেক্তিদের ই শুধু পরিপূর্ণ সালাত হয়। তাই আমাদের পরিপূর্ণ সালাত কায়েমের জন্য অবশ্যই দ্বীনের বা স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে ওই স্তরে পৌছাতে হবে।

সিয়াম বা রোজাঃ সিয়াম বা রোজা মুমিনদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্যে সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা **মুত্তাকী** হতে পার। এগুলো গোনা কয়েক দিন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণের যদি তোমরা জানতে। রমাজান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবর্তীর্ণ হয়েছে।সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেউ অসুস্থ্য থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্যে কষ্টকর তা চান না, এজন্যে যে তোমাদের সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মাহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। (সূরা বাকারাহ ২:১৮৩-১৮৫) রাসূলুল্লাহ(সো:)ইরশাদ করেন, সিয়াম ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনোদিন সিয়াম পালন করলে তার মুখ থেকে যেন অশ্লীল কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে অথবা ঝগড়ায় প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে, আমি রোজাদার। (বুখারী: ১৮৯৪, মুসলিম:১১৫১) কেউ যদি (রোজা রেখেও) মিথ্যা কথা বলা ও খারাপ কাজ পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু পানাহার ত্যাগ করা (অর্থাৎ উপবাস ও তৃষ্ণার্ত থাকা) আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী) অনেক রোজাদার ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের রোজার বিনিময়ে অনাহারে থাকা ব্যতিত আর কিছুই লাভ হয় না। আবার অনেক রাত জাগরণকারী এমন রয়েছে যাদের রাত জাগার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। (ইবনে মাজাহ, নাসাঈ) সিয়ামের মুল উদ্দেশ্য হল কথা, চিন্তা, কাজ সকল ক্ষেত্রে সংযম করে তাকওয়া অর্জন করা যাতে সিয়াম পালন না করার সময়ও পানাহার ও সহবাস বেতিত বাকি সকল ক্ষেত্রে সংযম বজায় রেখে দ্বীন বা স্বভাব চরিত্রের সংশোধন করে মুত্তাকি বা মুসলমান স্তরে পৌঁছানো।

যাকাতঃ যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ ইবাদত।এর শাব্দিক অর্থ পবিত্র, বিশুদ্ধ, প্রবৃদ্ধি, প্রশংসা।। এই মর্মে আল্লাহ বলেন আর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও (তা-ই বৃদ্ধি পায়) সুতরাং তারাই সমৃদ্ধশালী। (সূরা রুম, আয়াত:৩৯) আমি যদি তাদেরকে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখবে, আর সব কাজের চূড়ান্ত পরিণতি একান্তই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। (সূরাহ হাজ্জ ২২: ৪১)।'তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা

দেখছেন। -সূরা বাকারা : ১১০, তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।'-সূরা নূর : ৫৬ এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।' আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত। -সূরা আল ইমরান : ১৮০ যাকাত সম্পর্কে রাসুল সঃ বলেন 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দেয়নি কিয়ামতের দিন তা বিষধর স্বর্পরূপে উপস্থিত হবে এবং তা তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার উভয় অধরপ্রান্তে দংশন করবে এবং বলবে, আমিই তোমার ঐ ধন, আমিই তোমরা পুঞ্জিভূত সম্পদ।' -(বুখারী) মুলত যাকাত হল হালাল পন্থায় উপার্জিত সম্পদকে পবিত্রকরন যা একদিকে সামর্থ্যহীনদের সহায়তা সহ ইসলামি রাষ্ট্রের সকল কল্যাণমুখী কাজের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের হক বা অধিকার অন্যদিকে সামর্থ্যবানদের তাকওয়া অর্জনের একটি আবশ্যিক ইবাদত।

কোরবানিঃ কোরবানি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এই মর্মে আল্লাহ বলেন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে কোরবানিকে ইবাদতের অংশ করেছি। যাতে জীবনোপকরণ হিসেবে যে গবাদি পশু তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে আর সব সময় যেন মনে রাখে **একমাত্র আল্লাহই তাদের উপাস্য। অতএব তাঁর কাছেই পুরোপুরি সমর্পিত হও**। আর সুসংবাদ দাও সমর্পিত বিনয়াবনতদের, আল্লাহর নাম নেয়া হলেই যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে, নামাজ কায়েম করে আর আমার প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে দান করে। কোরবানির পশুকে আল্লাহ তাঁর মহিমার প্রতীক করেছেন। তোমাদের জন্যে এতে রয়েছে বিপুল কল্যাণ। অতএব এগুলোকে সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় এদের জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। এরপর এরা যখন জমিনে লুটিয়ে পড়ে, তখন তা থেকে মাংস সংগ্রহ করে তোমরা খাও এবং কেউ চাক না চাক সবাইকে খাওয়াও। এভাবেই আমি গবাদি পশুগুলোকে তোমাদের প্রয়োজনের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো। কিন্তু মনে রেখো কোরবানির মাংস বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আল্লাহর কাছে পৌঁছায় **শুধু তোমাদের তাকওয়া।** এই লক্ষ্যেই কোরবানির পশুগুলোকে তোমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কল্যাণ দিয়েছেন, সেজন্যে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো। হে নবী! আপনি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দিন যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। (সূরা হজ, আয়াত ৩৪-৩৮) ছেলে যখন পিতার কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার মতো বড় হলো, তখন ইব্রাহিম একদিন তাকে বলল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে কোরবানি দিতে হবে। এখন বলো, এ ব্যাপারে তোমার মত কী? ইসমাইল জবাবে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। ইনশাল্লাহ! আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে বিপদে ধৈর্যশীলদের একজন হিসেবেই পাবেন।' (সূরা সাফফাত, আয়াত ১০২) মনে রেখো, এ ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে সুযোগ দিলাম এক মহান কোরবানির। পুরো বিষয়টি স্মরণীয় করে রাখলাম প্রজন্মের পর প্রজন্মে। ইব্রাহিমের প্রতি সালাম। এভাবেই আমি সৎকর্র্মশীলদের পুরস্কৃত করি। (সূরা সাফফাত, আয়াত ১০৬-১১০) প্রকৃত পক্ষে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে নিজের পশুত্বকে বা নফসকে দমন করে নিজের সকল পছন্দের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করা বা তার পূর্ণ আনুগত্য করাই বা তাকওয়া অর্জন করে দ্বীন বা স্বভাব চরিত্রের সংশোধন করে মুত্তাকি বা মুসলমান স্তরে পৌঁছানোই কোরবানির মুল শিক্ষা।

হজ্বঃ হজ্ব মূলত আত্মিক, শারীরিক ও আর্থিক এগুলোর সমন্বিত একটি ইবাদত। সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর একবার হজ্ব পালন করা ফরয। এই মর্মে আল্লাহ বলেন 'মানুষের মধ্যে যারা সেখানে (বায়তুল্লাহ) পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্ব করা ফরয। আর কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।-(সূরা আলে ইমরান ৩ : ৯৭) আর তোমরা হজ ও উমরা পূর্ণ কর আল্লাহর উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদঈ প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুন্ডন করো না যে পর্যন্ত হাদঈ তার স্থানে না পৌছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু যবেহ দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য হাদঈ যবাই করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা **আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর** এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। হজ্ব হয় সুবিদিত মাসগুলোতে তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্ব করা স্থির করে সে হজের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও

কলহ-বিবাদ করবে না। আর তোমরা উত্তম কাজ থেকে যা-ই কর আল্লাহ তা জানেন(৫) আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর(৬)। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে **তাকওয়া**। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা **আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর**। (সূরা বাকার- ১৯৬ - ১৯৭) সামর্থ্যবানদের তাকওয়া অর্জনের একটি আবশ্যিক ইবাদত হল হজ্ব।

পবিত্র কোরআনের অলোকে আমরা মহান আল্লাহ্র দয়ায় বুঝি যে সকল প্রার্থনা বা ইবাদতের মুল উদ্দেশ্য বা প্রান হল দ্বীন বা স্বভাব চরিত্রের সংশোধনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করে প্রকৃত মুমিন বা মুত্তাকি বা মুসলমান স্তরে পৌঁছানো। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা অধিকাংশ ইসলাম ধর্মের অনুসারী বা পালনকারী দাবিদারবৃন্দ ইসলামের এই মুল বা প্রান কে বাদ দিয়ে প্রার্থনা বা ইবাদতের বাহ্যিক আচরণ বা খোলস নিয়ে সীমাহীন আত্মতুষ্টির মধ্যে ডুবে আছি এবং নিজের অজান্তেই দ্বীনের বা ধর্মের বা স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে কাফের, মুশরিক বা মুনাফিক রয়ে গেছি। এর মুল কারন হল পবিত্র কোরান ও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহিহ হাদিসের মর্ম বুঝতে অপারগতা এবং কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক জাল হাদিসের উপর নির্ভরতা।

এই মর্মে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর / অজ্ঞ / মূর্খ লোক আছে যারা মিথ্যা আশা ছাড়া কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে অতএব তাদের জন্যে আফসোস! (সূরা আল বাক্কারাহ ৭৮) বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি; সুতরাং তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়; ফলে মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বর্ণনা করছ তার জন্য দুর্ভোগ তোমাদের! (আল-আম্বিয়া ১৮) আর আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় অন্তরসমূহে যা আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবগত। আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপসমূহ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। (আশ-শূরা ২৪-২৫) তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়; পরম দয়ালু। (আল-হাদীদ ৯) আর নিশ্চয় এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ / সম্মানের বস্তু; এবং অচিরেই তোমাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। (আয-যুখরুফ ৪৪)। তা তো বিশ্বজগতের জন্যই উপদেশ। (আল-ক্বলাম ৫২) নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (আল-কামার ১৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।(সূরা ক্বাফ ৩৭) নিশ্চয় এ কুরআন তো সকলের জন্য উপদেশবাণী। অতএব যার ইচ্ছে সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক। আর আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না; তারাই উপযুক্ত যারা একমাত্র তারই **তাকওয়া** অবলম্বন করে, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। (আল-মুদ্দাসসির ৫৪-৫৬) অবশ্যই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করে বা অস্বীকার করে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (আল-আ'রাফ ৪০) আমি সত্যসহ এ কোরআন নাযিল করেছি এবং সত্য সহ এটা নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল ১০৫) নিশ্চয় যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে, (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।) আর এ অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ। মিথ্যা / বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত। (হা-মীম আস-সাজদা ৪১-৪২) এই কুরআনে বহু কথাই আমি বারবার (বিভিন্নভাবে) বিবৃত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। সূরা বনী ইসরাঈল ৪১) আমি অবশ্যই মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন প্রকার উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্য প্রত্যাখ্যান ব্যতীত ক্ষান্ত হল না। (সূরা বনী ইসরাঈল ৮৯)

আর যারা তাদের দ্বীনকে বা ধর্মকে বা স্বভাব চরিত্র কে (ইসলামকে বা আত্মসমর্পণকে) ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে আপনি তাদের পরিত্যাগ করুন। আর আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তা গ্রহণ করা হবে না। এরাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হয়েছে; কুফরীর কারণে এদের জন্য রয়েছে অতি উষ্ণ পানীয় ও কষ্টদায়ক শাস্তি। (আল-আন'আম ৭০) আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁর হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের উপর এরূপে অপবিত্রতা নির্ধারিত করেন। হাদিস শরিফে এসেছে, 'জেনে রেখো, মানুষের দেহের মধ্যে একখণ্ড মাংসপিণ্ড আছে, যখন তা সংশোধিত হয় তখন

গোটা দেহ সংশোধিত হয়ে যায়। আর যখন তা দূষিত হয় তখন পুরো দেহ দূষিত হয়ে যায়। মনে রেখো, সেটাই কলব বা অন্তর।' (বুখারি ও মুসলিম) 'নিশ্চয়ই সে সফলকাম, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ / পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, হবে, যে তাকে কলুষিত করবে। (সুরা : শামস, আয়াত : ৯)

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়

আমরা জানি যে রাসুলের জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর পর্যায়ক্রমে ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। ইসলামের প্রথম চার খলিফা এবং ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ব্যাতিত অন্য অধিকাংশ খলিফা বা শাসক দ্বীনের দিক থেকে উত্তম ছিলেন না। তাই উমাইয়া, আব্বাসিয়, ফাতেমিয়, অটোমান বা ওসমানীয়ও প্রমুখ অধিকাংশ খলিফাদের সময় সাম্রাজ্যের বিস্তার অব্যাহত থাকলেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার হয়েছে একথা বলা যাবে না। অবশ্য তাদের এই সাম্রাজ্যের বিস্তারের কারনে মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের ধর্ম প্রচার কাজ তুলনামুলক ভাবে সহজ হয়েছিল একথাও অস্বীকার করা যাবে না। এই সকল শাসকদের মধ্যে অনেক দক্ষ শাসক ও ছিলেন যারা প্রজা কল্যাণে শাসকের দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। বিশেষ করে আব্বাসিয়দের সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলকেমি, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞানসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সমকালিন বিশ্বে এগিয়ে ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে একেক সময় একেকটি সভ্যতা শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক থেকে বা সামরিক বা অর্থনীতিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে তাদের বিভিন্ন যোগ্যতার জন্য, আবার তাদের অযোগ্যতা বা সীমালঙ্ঘনের কারনে তাদের পতন ও হয়। এটাই আল্লাহ্র বিধান এবং এই কারনেই ইতিহাসে আমরা দেখি যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, মিসরীয় সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা প্রমুখ বা বিভিন্ন যুগের বিখ্যাত সাম্রাজ্য সমূহ যাদের মধ্যে মঙ্গলীয়, ভারতীয় মোগল, অথবা আধুনিক যুগে ব্রিটিশ, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগিজ, প্রমুখ সাম্রাজ্য বা উপনিবেশিক জাতি সমূহ বা বর্তমানে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন প্রমুখ রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে বা দিচ্ছে আবার পতন ও হয়েছে বা হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে অধিকাংশ সময় বিভিন্ন দেশ, রাজ্য বা জাতি মুলত রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দ্বারা শাসিত ছিল বা এখনও কিছু দেশে আছে। মুলত আমেরিকার স্বাধীনতা ও পরবর্তীতে ফরাসি বিপ্লবের পর পৃথিবীতে শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গনতন্ত্র বিস্তার লাভ করে। সমসাময়িক শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে ব্রিটেন, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, জাপান প্রমুখ দেশ প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করে। পরবর্তীতে অবশ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশ বিশেষ করে রাশিয়া, দক্ষিন কোরিয়া এবং চীন প্রমুখ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হয়।বর্তমান বিশ্বে এখন পর্যন্ত উল্লেখিত দেশ সমুহই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেত্রিত্বস্থানীয়। বিশ্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গনতন্ত্র প্রসার লাভের মধ্যেই গত শতাব্দী থেকে বেশ কিছু মুসলিম অধ্যুষিত দেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন চলছে তবে যেকোনো কারনেই হউক একমাত্র ইরান ছাড়া আর কোথাও এই আন্দোলন সফল হয় নাই তথা রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা স্থায়ী বা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । কিছু বিভ্রান্তি বা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও বর্তমান আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার একমাত্র ও আদর্শ উদাহরণ নিঃসন্দেহে ইরান।

বর্তমান বিশ্ব সম্ভবত আমাদের জ্ঞাত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত করছে। প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পায়ন ও ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে আমরা আমাদের এই পৃথিবীকে এখন বিশ্বগ্রাম বলি। একই সাথে উন্নত দেশগুলো সামরিক দিক থেকেও ব্যাপক সক্ষমতা অর্জন করেছে। সামরিক দিক থেকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পারমানবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র আমেরিকা ও রাশিয়া স্নায়ু যুদ্ধ অবসানের পর এখন পশ্চিম এশিয়ায় বা মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইউক্রেন অঞ্চল সহ বেশ কিছু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরস্পরবিরোধী স্বার্থে মুখোমুখি অবস্থায় দাড়িয়ে অথবা ছায়া যুদ্ধে লিপ্ত । অপরদিকে বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যে নেত্রিত্বস্থানীয় রাষ্ট্র চীনের সাথে অপর শীর্ষ দেশ আমেরিকা বাণিজ্য যুদ্ধে লিপ্ত। আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র গুলো স্নায়ু যুদ্ধ বা ছায়া যুদ্ধ বা বাণিজ্য যুদ্ধ করলেও এখন পর্যন্ত সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়িয়ে চলেছে। এর কারন হল স্নায়ু যুদ্ধ বা ছায়া যুদ্ধ চলাকালে সামরিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অস্ত্র ব্যবসার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে কিন্তু সর্বাত্মক যুদ্ধ হলে উভয়পক্ষ ব্যাপক অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি সহ প্রানহানির স্বীকার হবে।

আমরা জানি যে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সূচক নিম্নগামী ছিল।আমরা এটাও দেখছি সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কারন মানুষের নৈতিকতার ব্যাপক অধঃপতন সহ পাপাচার ভয়াবহ রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মর্মে আল্লাহ বলেন ' মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; যাতে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয়। যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে।(সুরা-রুম, ৪১) আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।(সুরা আনফাল ২৫)। বর্তমানে প্রায় গত একশ বছরের মধ্যে ভয়াবহতম মহামারির প্রভাবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক প্রানহানি সহ অর্থনীতির অকল্পনীয় ও অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। এই ধরনের অতি জটিল পরিস্থিতিতে সাধারনত মানব চরিত্রের বা ধর্মের বা স্বভাবের ভাল ও খারাপ দুইটা দিকই ব্যাপক ভাবে উম্মচিত হয়ে থাকে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে অধিকাংশ মানুষ প্রথম গোত্রের অর্থাৎ ভাল চরিত্রের বা দ্বীনের বা স্বভাবের না। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল যেকোনো খারাপ জিনিস নিয়মিত ও অধিক পরিমানে দেখলে তা সম্পর্কে তার খারাপ বোধ ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা নষ্ট হয়ে যায়। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ব্যাপক খারাপ প্রভাব দেখার আশঙ্কা আছে কারন এত অধিক মৃত্যু দেখা, বিশেষ করে সামরিক সহ সব দিক থেকে শক্তিশালী উন্নত দেশগুলো যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিজেদের দেশের জনগনের এত অধিক মৃত্যু দেখে নাই, তা সবার সাথে সাথে তাদের উপর ও খুব খারাপ প্রভাব ফেলবে। সেই সাথে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয় এই মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতিতে আরও খারাপ মাত্রা যোগ করবে বলেই আশংকা। সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র গুলো সহ অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে না পারলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সমুহ সম্ভাবনা আছে। আর সর্বাত্মক যুদ্ধ মানে সেই পরিস্থিতিতে নিশ্চিতভাবেই পারমানবিক অস্ত্রের ব্যাবহার হবে যার পরিনতি আরও ব্যাপক ধ্বংস যজ্ঞ।

ইসলাম ধর্মের অনুসারি সহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারি বিভিন্ন পণ্ডিত বা গবেষকদের মতে হজরত ইমাম মেহেদী আঃ বা শেষ অবতার বা কল্কি অবতার এর আবির্ভাব এবং হজরত ইসা আঃ এর অবতরন অতি সন্নিকটে।(একমাত্র আল্লাহ্ই প্রকৃত সত্য জানেন) ইমাম মেহেদীর আবির্ভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদিস বিশ্লেষণ করলে তার সারমর্ম রূপে আমরা পাই যে তার আবির্ভাবের পূর্বে কেয়ামতের অনেক ছোট ছোট লক্ষন দেখা দিবে যার অধিকাংশ ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, ও অনেক এবং ব্যাপক যুদ্ধে (সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ) বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রানহানি হবে। সুনিদ্রিস্ট সময় তার আবির্ভাবের পর সুনিদ্রিস্ট লক্ষন থেকে তার আবির্ভাবের কথা জানা যাবে এবং তাকে চেনা যাবে। তার আবির্ভাবের পর হজরত ইসা আঃ অবতরন করবেন এবং দজ্জালকে হত্যা করবেন। ইমাম মেহেদী আঃ ও হজরত ইসা আঃ এর উপর আনুগত্য করা সমগ্র মানব জাতির জন্য আবশ্যক। সমগ্র বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা স্বভাব ইসলাম বা আত্মসমর্পণ এর অনুসারি হওয়ার আহবানের পর যারা তাদেরকে অস্বীকার করে তাদের উপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিবে, তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে বা জেহাদে তারা জয়লাভ করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবেন। এই সুনিদ্রিস্ট ঘটনা ও লক্ষন দেখা যাবার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি দাবি করে তিনি ইমাম মেহেদী তাহলে তিনি সন্দেহাতীতভাবে মিথ্যাবাদী বা এই বিষয়ে বিভ্রান্ত। আর সুনিদ্রিস্ট ঘটনা ও লক্ষন দেখা যাবার পূর্বে ইমাম মেহেদী আঃ কে তা জানার চেষ্টা করা অপ্রয়োজনীয় বা অর্থহীন।

প্রকৃত বাস্তবতায় ইমাম মেহেদীর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ একটি অনিশ্চিত বিষয় কারন আমাদের হায়াতের বিষয় আমরা কেহই নিশ্চিত না। তবে একটা বিষয় অবধারিত বা নিশ্চিত তা হল মৃত্যু। কারন প্রত্যেক মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে এবং আল্লাহ্র মুখোমুখি হতে হবে। যখন আমাদের প্রভুর ব্যাপারে বা ইলাহার ব্যাপারে, দ্বীনের বা স্বভাব চরিত্রের ব্যাপারে এবং রাসুল সঃ কে অনুসরনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে বা পরীক্ষা বা মূল্যায়ন করা হবে। অতএব আমরা ইমাম মেহেদী বা হজরত ঈসা আঃ সাক্ষাৎ পাই বা না পাই আমরা যদি আমাদের দ্বীন বা স্বভাব সংশোধন করতে না পারি বা তাকওয়া অর্জন করতে না পারি তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাব। আমাদের তাকওয়া যদি উন্নত স্তরের না হয় তাহলে আমরা ইমাম মেহেদীর সাক্ষাৎ লাভ করে তার পক্ষে জিহাদের সুযোগ পেলেও ওহদের যুদ্ধের মত যুদ্ধের মাঠ থেকে পালাতে হতে পারে যা মোটেই সম্মানজনক না। আমাদের ওই অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করেছেন তবে আবার ও একই অপরাধ করলে আল্লাহ পুনরায় ক্ষমা করবেন তার কোন নিশ্চয়তা নাই।

বর্তমানে এই মহামারী বা এর পরবর্তী পরিস্থিতিতে আমাদের অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে মাফ চাওয়া, তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসা ও নিজেদেরকে সংশোধন করে সৎপথে অবিচল থাকতে হবে। যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারন করতে হবে ও নিজেদের দ্বীন বা ধর্ম বা স্বভাব বা চরিত্র সংশোধন করে মুত্তাকী বা মুসলমান স্তরে পৌছে নিজেদের মধ্যে আত্মিক ভাবে ও শারীরিক ভাবে পরিপূর্ণ সালাত বা আল্লাহ্র স্মরণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রমযান মাসে

আল্লাহ হায়াত দিলে প্রকৃত সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। আর মহান আল্লাহ্ তার সৃষ্টি জগতের যেকোনো স্থান থেকেই আমাদেরকে দেখেন বা আমাদের কথা বা প্রার্থনা শুনেন। মহান আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব,যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। (সূরা আনআম, ১০৪ আয়াত)

কৃতজ্ঞতাঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্রই আল্লাহ্র। মহা পবিত্র স্রষ্টার প্রতি সমগ্র অস্তিত্ব থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যদি তার অতি তুচ্ছ এই গোলামের অস্তিত্ব বলে আদৌ কিছু থাকে। যিনি তার অতি তুচ্ছ এই গোলাম কে দয়া করেছেন, দয়া করে জ্ঞান দান করেছেন, তার প্রতি সমর্পিত করেছেন, এই জ্ঞান প্রকাশের উপযুক্ততা দান করেছেন, যাতে করে তা হেদায়েতের উপযুক্তদের হেদায়েতের ওসিলা হতে পারে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ্র সেই সকল সৃষ্টির প্রতি যাদের ওসিলায় তিনি তার অতি তুচ্ছ এই গোলাম কে জ্ঞান দান করেছেন। বিশেষ করে আমার পিতা **খাদেমুল ইসলাম ডাঃ এ এন এম এ মোমিন রহঃ** এর প্রতি, যিনি ছিলেন মহান আল্লাহ্র বিশেষ দয়াপ্রাপ্ত মুত্তাকী স্তরের বান্দা যার জ্ঞান ছিল অতি উচ্চ মানের এবং অবশ্যই কৃতজ্ঞতা আমার মুর্শিদ **হজরত শাহ সুফি সৈয়দ লোকমান হাকিম আল কোরাইশী রহঃ** এর প্রতি যিনি ছিলেন বাকা বিল্লাহ (আল্লাহ্র হয়ে যাওয়া বা তার সাক্ষাত লাভ করা বা তার নৈকট্য অর্জন করা) বা সর্বোচ্চ স্তরের আল্লাহ্র অলি বা আলেম।

আমাদের সকল সালাম শ্রদ্ধা, আমাদের সব নামায এবং সকল প্রকার পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। হে নবী, আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হউক। আমাদের এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের উপর আল্লাহ্র রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া (ইবাদাতের যোগ্য) আর কেউ নেই,আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের ওপর এই রূপ রহমত নাজিল করো, যেমনটি করেছিলে ইব্রাহিম ও তার বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সা.) এবং তার বংশধরদের ওপর বরকত নাজিল করো, যেমন বরকত নাজিল করেছিলে ইব্রাহিম ও তার বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।

বিনীত

ইবনে মোমিন
Email: **ibnemomin.none@gmail.com**
Website: **www.islamthetruth.info**